বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাস

বেদ পরিচয়

"প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে,
জ্ঞানধর্ম কত কাব্য-কাহিনী।"

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাচীনতম লিখিত বিবরণ আমরা যেখান থেকে পাই তাকেই আমরা বেদ বলে জানি। বেদ শুধু ভারতবর্ষের নয় বিশ্বের প্রাচীনতম গ্রন্থ। 'বেদ' বলতে আমরা সাধারণভাবে ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব বেদকে বুঝে থাকি। জ্ঞানার্থক বিদ্ ধাতু থেকে (বিদ্ + ঘঞ্ = বেদ) 'বেদ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। বেদ শব্দের অর্থ হল জ্ঞান। আবার "বিদ্যতে অনেন ইতি বেদঃ" —এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে বিদ্ ধাতুর উত্তরে করণে 'ঘঞ্' প্রত্যয় করে যে 'বেদ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয় তার অর্থ হল — যার দ্বারা জানা যায়। অর্থভেদে বিদ্'ধাতু চারটি— জ্ঞান, লাভ, সত্তা ও বিচারার্থক। সত্তাবাদী 'বিদ্' ধাতু অকর্মক আর বাকি তিন অর্থে বিদ্ ধাতু সকর্মক। প্রসিদ্ধ বেদ ভাষ্যকার আচার্য সায়ণ এর মতে — "ইষ্ট প্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারের অলৌকিক উপায় যে গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি তা-ই বেদ"। অর্থাৎ বেদ হল জ্ঞান। জ্ঞান বলতে এখানে পরমজ্ঞানকেই বুঝতে হবে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন — "প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা যে জ্ঞানলাভ করা যায় না, সেই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান 'বেদ' থেকে লাভ করা যায় বলেই বেদকে 'বেদ' বলা হয়। বেদই প্রকৃত ভারতবর্ষের মর্মবাণী। স্মৃতিকার মনু বেদকে অখিল ধর্মের মূল বলেছেন — "বেদঃ অখিলধর্মমূলম্" (মনুসংহিতা ২/৬)। ধর্মশাস্ত্রকার গৌতম ও একই কথা বলেছেন — "বেদো ধর্মমূলম্"।

বেদকে শ্রুতি বলা হয় — নিরুক্তকার যাস্কের ব্যাখ্যানুসারে ঋষিগণ হলেন সাক্ষাৎ কৃতধর্মা। এদের ঋষিত্ব সাক্ষাৎ দর্শন দ্বারা। ঋষিদের উপদেশে যাঁরা বেদমন্ত্র প্রাপ্ত হলেন তাঁরা শ্রুতর্ষি। এদের ঋষিত্ব সাক্ষাৎ নয়, শ্রবণ দ্বারা। এদের পরবর্তী তৃতীয়স্তরে বেদ-বেদাঙ্গের রচনাকাল। এই শ্রুতর্ষিকালেই বেদের নাম হয়েছিল শ্রুতি। এক কথায় গুরু-শিষ্য শ্রবণ পরম্পরায় বেদ মন্ত্র প্রাপ্ত এবং লিখিত হয়েছিল বলে বেদের অপর নাম 'শ্রুতি'। বেদকে আবার 'ত্রয়ী' ও বলা হয়। 'ত্রয়ী' বলতে ঋক্, সাম্ ও যজুঃ এই তিন শ্রেণির মন্ত্রকে বোঝানো হত। অথর্ববেদ 'ত্রয়ী'র অন্তর্ভুক্ত ছিল না — এটি পরবর্তী কালের সংযোজন।

বর্তমানকালে বৈদিক সাহিত্য বলতে আমরা সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদকে বুঝি। সংহিতা বলতে ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। প্রতিটি সংহিতার এক বা একাধিক

ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ আছে। ব্রাহ্মণকে বেদের কর্মকাণ্ড এবং আরণ্যক ও উপনিষদকে বেদের জ্ঞান কাণ্ড বলা হয়। বেদাঙ্গ গ্রন্থ ও বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। বেদাঙ্গ সংখ্যায় ছয়টি — শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ। বেদার্থ উপলব্ধির জন্য বেদাঙ্গ জ্ঞান অপরিহার্য। পরবর্তীকালে এই সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ, বেদাঙ্গ এবং তাদের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা নিয়ে গড়ে উঠেছিল বিশাল বৈদিক সাহিত্য, যা বৈদিক সাহিত্যের এক অমূল্য রত্নভাণ্ডার।

বেদের কাল

ঠিক কোন সময়ে বৈদিক সূক্তগুলি রচিত হয়েছিল তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা বর্তমানে সহজসাধ্য নয়। ভারতীয় দৃষ্টিতে বেদ অপৌরুষেয় এবং পরমব্রহ্মের নিঃশ্বসিত। কিন্তু প্রাচীন এই মত বর্তমানে আর সর্বজনগ্রাহ্য নয়। আধুনিক ঐতিহাসিক দৃষ্টিসম্পন্ন পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, বেদ অপৌরুষেয় বা অলৌকিক কোন জ্ঞান নয়। এটি প্রাচীন আর্যদের তৎকালীন সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অগ্রগতির লিপিবদ্ধ বিবরণ মাত্র এবং তা বিভিন্ন সময়ে সংকলিত হয়েছিল। বৈদিক যুগ ও আমাদের যুগের মধ্যে কালগত ব্যবধান এত বেশী যে, আমাদের পক্ষে বেদের কাল নির্ণয় করা প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই ব্যাপারে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা প্রথম বেদের কাল নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছিলেন। নিম্নে সংক্ষেপে বেদের রচনাকাল সম্পর্কে আলোচিত হল—

ভাষাতাত্ত্বিক দিক : ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেকে ঋগ্বেদকে এক সময়ের রচিত একটি গ্রন্থ বললে ভুল হবে। কারণ ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্রে অগ্নির স্তুতি করতে গিয়ে প্রাচীন ঋষিদের স্তুতির উল্লেখ করা হয়েছে। এই বৈদিক সাহিত্য সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ এই তিনভাগে বিভক্ত। উপনিষদের দার্শনিক চিন্তা ভাবনা যে অল্প সময়ে গড়ে উঠতে পারেনি তা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়।

ম্যাক্সমূলারের মত : পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে সর্বপ্রথম Max Muller ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বেদের রচনাকাল নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর মতে সূত্র সাহিত্য বৌদ্ধ ধর্মের সমসাময়িক। এর কাল ৬০০-২০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। ব্রাহ্মণ আরও প্রাচীন ৮০০-৬০০ খ্রীঃ পূঃ। ঋগ্বেদের মন্ত্রভাগের রচনাকাল তাঁর মতে ১০০০-৮০০ খ্রীঃ পূঃ। সুতরাং ঋগ্বেদ আরও অনেক পূর্বে সম্ভবত—১২০০-১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে সংকলিত হয়েছিল।

ভিন্টারনিৎসের মত : বেদের কাল নির্ধারণে তিনি প্রধানত ভাষাতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভর করতে চেয়েছেন। ঋগ্বেদ যে ভাষাগত দিক হতে কত প্রাচীন তা Winternitz এর উদ্ধৃত উক্তিতেই স্পষ্ট — "The Rgveda presapposes nothing of that which we know in Indian Literature and the whole of Indian life pre-sappose the Veda". সুতরাং তাঁর মতে, বৈদিক যুগের আরম্ভ অন্ততপক্ষে ২৫০০-২০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ হতে পারে।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ভাষাতত্ত্ববিদ্ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে,

আবেস্তা ও বৈদিক সংস্কৃত ভাষায় অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। তখন কিন্তু বৈদিক ভাষার বৈসাদৃশ্য ছিল না। ড. চট্টোপাধ্যায়ের মতে উভয় ভাষায় যে বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তা গড়ে উঠতে আরও ৩০০-৪০০ শত বছর সময় লাগতে পারে। সুতরাং তাঁর মতে ঋগ্বেদের রচনাকাল খ্রীঃ পূর্ব ১০০০-৯০০ বলে মনে করা হয়।

অধ্যাপক টি. বারো এর মত : ভাষাতত্ত্বের ভিত্তিতে বৈদিক সাহিত্যের কাল নির্ণয় করেছেন অধ্যাপক টি. বারো। তাঁর মতে প্রাচীনতর বৈদিক সাহিত্য অর্থাৎ ঋগ্বেদের প্রথম থেকে নবম মন্ডলের সূক্তগুলি ১২০০-১০০০ খ্রীঃ পূঃ এর মধ্যে এবং ঋগ্বেদের দশম মন্ডল থেকে উপনিষদ পর্যন্ত ১০০০-৭০০ খ্রীঃ পূঃ এর মধ্যে রচিত হয়েছিল।

ড. সুকুমার সেনের মত : ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণের ভিত্তিতে ড. সুকুমার সেন এই সিদ্ধান্ত করেন যে, খ্রীঃ পূঃ একাদশ থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে ঋগ্বেদ রচিত হয়েছিল।

ভৌগোলিক ও ভূ-তাত্ত্বিক অবস্থার দিক : ভৌগোলিক ও ভূ-তাত্ত্বিক অবস্থার দিক থেকে কোন কোন পন্ডিত বেদের কাল নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছেন।

অধ্যাপক অবিনাশ চন্দ্র দাসের মত : অধ্যাপক দাস মহাশয় ভৌগোলিক ও ভূ-তাত্ত্বিক গবেষণার সাহায্যে প্রমাণ করা চেষ্টা করেছেন যে, ঋগ্বেদের প্রাচীনতম অংশের রচনাকাল খ্রীঃ পূঃ ২৫,০০০-২০,০০০ অব্দ। Winternitz অবশ্য এই মত সমর্থন করেন না। তাছাড়া জীব-তত্ত্ব বিদ্‌গণের মতে খ্রীঃ পূঃ ১৬,০০০ অব্দে পৃথিবীতে মানবসমাজের সৃষ্টিই হয়নি।

নারায়ণ রাও ভবনরাও পারঙ্গির মত : পারঙ্গির মতে ঋগ্বেদের রচনাকাল ৭০০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ।

প্রত্নতাত্ত্বিক দিক : ১৯০৭ খ্রীঃ এশিয়া মাইনরের বোঘাজকোই নগরে Hugo Winckler কিউনিফর্ম অক্ষরে ও মৃত্তিকা অক্ষরে নির্মিত কয়েকটি লিপিফলক আবিষ্কার করেন। এগুলি খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থশতকের হিট্টাইট শাখার অন্তর্ভুক্ত। এগুলিতে বৈদিক দেবতা মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র ও নাসত্যের নাম পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক মেয়ার এঁদের পূর্ণরূপে বৈদিক দেবতাররূপে স্বীকার না করলেও স্টেনকোনো, হিল্লেব্রান্ট, Winternitz প্রভৃতি পন্ডিতদের মতে এঁরা নিঃসন্দেহে বৈদিক দেবতা। অতএব চতুর্দশ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের পূর্বেই ঋগ্বেদ রচিত হয়েছিল বলা যায়।

আবার অনেকের মতে হরপ্পা সভ্যতা প্রাক্ আর্যযুগের সভ্যতা। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে (৬২৭/৫) 'হরিয়ুপীয়া' শব্দটি পাওয়া যায়, যা কোন নদী বা নগরীর নাম বলে আচার্য সায়ন ব্যাখ্যা করেছেন। শব্দটি 'হরপ্পা' নগরীকে বোঝালে ঋগ্বেদের রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০-২০০০ বলা যায়। কারণ হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সভ্যতার কাল ধরা হয় ৩০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ।

জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত দিক : জ্যোতিষ সংক্রান্ত তথ্যের উপর গবেষণা করে অনেকে

ঋগ্বেদের রচনাকাল নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছেন।

লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক, জ্যাকবি এবং ড. বুলারের মত : বালগঙ্গাধর তিলক ও জ্যাকবি জ্যোতিষ সংক্রান্ত তথ্যের উপর গবেষণা করে। ঋগ্বেদের রচনাকাল নির্ণয়ে অগ্রসর হয়েছেন। সংহিতার যুগে বসন্তকালীন বিষুব সংক্রান্তি মৃগশিরা নক্ষত্রে হয়েছিল। গণনা করে তার কাল ধরলে ৪৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পাওয়া যায়। ড. বুলার এই মত সমর্থন করেন। জ্যোতির্বিদ ড. ভি, বি, কেট্‌কার তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের (৩/১/৫) একটি গ্রহণ সংক্রান্ত বচনের বিচার করে ঐ ব্রাহ্মণের রচনাকাল ধরেছেন ৪৬৫০ খ্রীঃ। সুতরাং ঋগ্বেদের রচনাকাল তার ও অনেক পূর্ববর্ত্তী। প্রাচ্য জ্যোতির্বিদ থিবো অবশ্য এরকম গণনাকে যথার্থ বলে স্বীকার করেন নি।

জ্যোতিষের সাহায্যে ঋগ্বেদের রচনার কাল নির্ণয় করার জন্য তিলক ও জ্যাকবি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কাছে কঠিন সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এ সম্পর্কে Winternitz বলেছেন — "Allempts to determined period of the Veda by the aid of astronomy come to grief owing to the fact that these-certain passages in the vedic test which admit astronomical calculation may be, they prove nothing unless the text in great on admit of an unambiguous interpretation."

শংকরবালাকৃষ্ণ দীক্ষিতের মত : মহারাষ্ট্রের প্রখ্যাত জ্যোতিষী শংকরলালকৃষ্ণ দীক্ষিত ব্রাহ্মণের (২/১/২) তে কৃত্তিকা পুঞ্জের অবস্থান দেখে ঋগ্বেদের রচনাকাল ৩৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পূর্ববর্তী বলেছেন।

কামেশ্বর আয়ারের মত : মাদ্রাজের কামেশ্বর আয়ার ও কৃত্তিকাপুঞ্জের অবস্থান দ্বারা ২৩০০-২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দকে ব্রাহ্মণ যুগ বলে মনে করেছেন।

ঐতিহাসিক দিক

ম্যাক্‌ডোনেলের মত : অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেলের মতে এশিয়া মাইনরে আবিষ্কৃত 'ভোগনকোঈ' শিলালেখের উপর ভিত্তি করে এবং ঋগ্বেদ ও আবেস্তার তুলনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ঋগ্বেদ আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ১৩০০ বা ১৪০০ অব্দে উদ্ভূত হয়েছিল।

আর. জি. ভাণ্ডারকরের মত ঃ ঈশোপনিষদের তৃতীয় মন্ত্রে যে 'অসূর্যা' শব্দটি আছে, তা অ্যাসিরিয়া নামক দেশকে বোঝায়। এই তথ্যের উপর নির্ভর করে ভান্ডার বলেন ২৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে ঋগ্বেদের সৃষ্টি হয়েছিল।

বেদের কাল নির্মণে আরও কতকগুলি মত ঃ

অধ্যাপক বৈদ্য ৪৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৮০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দকে সম্পূর্ণ বৈদিক যুগ বলেছেন। মার্কিনদেশীয় পণ্ডিত ব্লুমফিল্ড ৪৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দকে বৈদিক যুগের প্রারম্ভকাল

বলে ধরেছেন। প্রসিদ্ধ ইংরেজ ভারততত্ত্ববিদ্ পার্জিটার পুরাণের নানা তথ্যের ভিত্তিতে খ্রীষ্টপূর্ব দশম শতকের মধ্যভাগকে মহাভারতের কালরূপে চিহ্নিত করেছেন। বেদের রচনাকাল তারও পূর্ববর্তী অর্থাৎ আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব একাদশ শতাব্দী। পুরাণগুলিকে প্রামাণ্যগ্রন্থ হিসাবে স্বীকার না করলেও ঐতিহাসিক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী খ্রীষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীকে মহাভারতের কাল বলে উল্লেখ করেছেন এবং খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতককে ঋক্ বেদের রচনাকাল রূপে উল্লেখ করেছেন।

উপরিউক্ত মতগুলি পর্যালোচনা করে বেদের কাল সম্পর্কে কোন সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া প্রায় অসম্ভব। মূলত বেদ বলতে সংহিতা চতুষ্টয় ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ সমূহকে বোঝায়। সুতরাং বেদের একটি নির্দিষ্টকাল হতে পারে না। এই একই কারণে অধ্যাপক Winternitz বলেছেন — "It is foolish to ascertain a definite date for both the samhita period and the Brahmana period of veda." পৃথিবীর কোন ব্যক্তিই সঠিকভাবে বেদের কাল নির্ণয় করতে পারেন না। Max Muller যথার্থই বলেছেন — "Whethre the vedic hymns were composed in 1000 or 1500 or 2000 or 3000 B.C. no power on earth will ever determine."

ঋক্‌বেদ

প্রচলিত মতে বেদ অপৌরুষেয় কোন মানুষ দ্বারা রচিত নয়। তা ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত ধর্মশাস্ত্র-অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান-এর উক্তি অভ্রান্ত। ঋষিরা বেদ মন্ত্রের দ্রষ্টা মাত্র রচয়িতা নন। এই মতের সমর্থনে বহুশাস্ত্রবাক্যও রয়েছে।

পক্ষান্তরে দেখা যায় বেদ সংহিতার বিভিন্ন অংশের সঙ্গে ঐ অংশের রচয়িতার নামও রয়েছে। মন্ত্রের উক্তি থেকেও পাওয়া যায়, যে বিশেষ কোন ঋষি বিশেষ এক দেবতার তুষ্টি বিধানের জন্য স্তোত্র রচনা করলেন। যেমন পাই আমরা কাশীরাম দাসের মহাভারতে এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণে ভনিতারূপে কবির আত্মপরিচয়।

'ধেনুরং ন ত্বা সূয়বসে দদুক্ষন্নুপ ব্রহ্মাণি সসৃজে বসিষ্ঠঃ' (৭।১৮।৪)- ধেনু হতে দুগ্ধ দোহনের ন্যায়, হে ইন্দ্র তোমা হতে প্রার্থিত বস্তু লাভের জন্য বসিষ্ঠ এই স্তোত্ররচনা করেছেন।

ঋষিরা তাঁদের উপাস্য দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিজমুখে স্তব রচনা করতেন তা ও পাওয়া যায়। কণ্বপুত্র মেধাতিথি বলেছেন- 'অয়ং স্তোমঃ বিপ্রেভিঃ অসয়া চকারি' (১।২০।১) -বিপ্র অর্থাৎ মেধাবিগণ এই স্তোত্র নিজমুখে রচনা করেছেন। ঋগ্বেদেরমধ্যে এই প্রকার উক্তি এত অধিক যে তা থেকে স্বভাবতই সিদ্ধান্ত করতে হয় যে ঋষিরাই ঋগ্বেদের

রচয়িতা।

ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব এই চার বেদের মধ্যে ঋগ্বেদ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিত সকলেই একে পৃথিবীর যাবতীয় মানব জাতির আদিগ্রন্থ বলে স্বীকার করেছেন। ঋগ্বেদের আরও বৈশিষ্ট্য এই যে এটি অতিপ্রাচীন হলেও এর মূল রূপের কিছুমাত্র বিকৃত হয় নি।

ঋক্‌বেদের ঋক্, মন্ত্র বা স্তোত্রগুলির রচনা কাল সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের পরস্পর মতভেদ রয়েছে। মার্টিন ও কোলব্রুকের মতে ঋক্‌বেদ খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০-১৪০০ এর মধ্যে রচিত। ম্যাক্স মুলার বলেন -ঋগ্বেদীয় স্তোত্র রচনার কাল খ্রীষ্টপূর্ব১৫০০-১০০০ বৎসর এর মধ্যে। বালগঙ্গাধর তিলকের মতে এর রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০০ বৎসর। প্রত্যেকেই তাঁদের মতের সমর্থনে যুক্তির অবতারণা করেছেন। কাজেই ঋগ্বেদের বয়স বা রচনাকাল সম্বন্ধে নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্তে উপণীত হওয়া অসম্ভব।

ঋক্‌বেদের সংবাদসূক্ত

ঋগ্বেদ প্রধানত ধর্মমূলক গ্রন্থ হলেও ঋক্‌সংহিতায় প্রায় কুড়িটি সূক্ত পাওয়া যায়, যেগুলি সংবাদসূক্ত নামে পরিচিত। অর্থাৎ পারস্পরিক সংলাপ বা কথোপকথনের ভঙ্গিতে রচিত বলে এই সূক্তগুলির নাম 'সংবাদসূক্ত' বা Dialogue Hymns.

সংবাদসূক্তের বৈশিষ্ট্য : পণ্ডিতগণ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সংবাদসূক্তগুলির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেছেন। অনেকের মতে, সংবাদ সূক্তগুলির মধ্যে মহাকাব্য এবং নাট্যসাহিত্যের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র পরিলক্ষিত হয়। বর্ণনামূলক এই সূক্তগুলিকে Oldenberg 'আখ্যানসূক্ত' বা Narrative Hymns নাম দিয়েছেন। তাঁর মতে এগুলি প্রাচীন গাঁথা জাতীয় রচনার নিদর্শন। প্রাচীন মহাকাব্য ছিল গদ্য এবং পদ্যের সংমিশ্রণ। পরবর্তীকালে কেবল পদ্যাংশই সংরক্ষিত হয়েছিল। অন্যান্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ Oldenberg-এর এই সিদ্ধান্তের কঠোর সমালোচনা করেছেন। জার্মান পণ্ডিত Max Muller, ফরাসী পণ্ডিত Sylvan Levi-র মতে ঋগ্বেদের এই সংবাদ সূক্তগুলি নাটকের লক্ষণাক্রান্ত। এই মতবাদ Hertel, Schroeder, Macdonell প্রভৃতি পণ্ডিতগণও সমর্থন করেছেন। পণ্ডিতপ্রবর Winternitz এই পরস্পর বিরোধী দুটি মতের সমন্বয় সাধনে প্রয়াসী হয়ে বলেছেন – গাথা জাতীয় এই রচনাগুলি একাধারে মহাকাব্য ও নাটক উভয় জাতীয় রচনারই উৎস – "This ancient ballad poetry is the source both of the epic and of the drama for these ballads consist of a narrative and of a dramatic element." সুতরাং বলা যায় যে, সংবাদসূক্ত সম্বন্ধে উভয় মতবাদই আংশিকভাবে সত্য। মহাভারত, পুরাণ, বৌদ্ধ সাহিত্য, ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদ সাহিত্যেও এই জাতীয় রচনা দুর্লভ নয়। যেমন — ঐতরেয় ব্রাহ্মণের 'ইন্দ্র-রহিত সংবাদ', কঠোপনিষদের

'যম-নচিকেতা সংবাদ' — এই জাতীয় রচনার উদাহরণ। নিম্নে ঋগ্বেদের সংবাদ সূক্তগুলি সংক্ষেপে আলোচিত হল—

পুরুরবা-উর্বশী সংবাদ : ঋগ্বেদের এই সংবাদ সূক্তটি (১০/৯৫) অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবী রাখে। মর্ত্যের মানব পুরুরবা স্বর্গের অপ্সরা উর্বশীর প্রেমে গভীরভাবে আবদ্ধ। বর্ষচতুষ্টয় উর্বশী পুরুরবার পত্নীরূপে মর্ত্যভূমিতে অধিষ্ঠান করলেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন গর্ভবতী হয়ে অন্তর্ধান করলেন। পরিশেষে উর্বশীর সন্ধান পেলেন সঙ্গিনীদের সঙ্গে জলক্রীড়ায় ব্যাপৃতা এক সরোবরে। এইখানে উভয়ের কথোপকথনই এই সূক্তের বিষয়বস্তু। উর্বশীকে ফেরাতে না পেরে পুরুরবা প্রাণ বিসর্জন দিতে উদ্যত হলে, তাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টায় উর্বশী বললেন— "নারীজাতির সঙ্গে কোন স্থায়ী বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় না; হায়েনার হৃদয়ের মতই তাদের হৃদয় কঠোর ও নিষ্ঠুর।" সূক্তটি যুগপৎ সম্ভোগশৃঙ্গার ও বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারের মর্মস্পর্শী এক করুণ প্রেমকাহিনী। এর আবেদন চিরন্তন বিশ্বজনীন। পরবর্তীকালে ভারতীয় কবি মানসে এর প্রভাব দৃষ্ট হয়। 'হরিবংশ' 'বিষ্ণুপুরাণ' ও 'কথাসরিৎসাগরে' এই কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। মহাকবি কালিদাসের 'বিক্রামর্বশীয়' নাটকের উৎস এই সংবাদ সূক্তটি। যাইহোক সূক্তটি কাব্যগুণে ও নাটকীয় সৌন্দর্যে উজ্জ্বল।

যম-যমী সংবাদ : ঋগ্বেদের এই সংবাদ সূক্তটি (১০/১০) প্রাচীনকালের আরও একটি মূল্যবান আখ্যান। সৃষ্টির প্রারম্ভে নিঃসঙ্গ নির্জনতায় কামাতুরা যমী কামোদ্দীপক ভাষায় তার ভ্রাতা যমের সঙ্গে দৈহিক মিলনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। যম ছিল অত্যন্ত সংযমী। ভ্রাতা-ভগিনীর মিলন যে অবৈধ ও নিষিদ্ধ তা ভালভাবে বুঝিয়ে ভগিনীকে সেই অন্যায় কাজ থেকে বিরত করল। এই আখ্যানটি কিভাবে সমাপ্ত হল তা সক্তে বর্ণিত হয় নি। পরবর্তী কোন সাহিত্য ও এই সংবাদের পরিণতির উপর আলোকপাত করেনি। Winternitz মনে করেন যে, সম্ভবত যমজ স্ত্রী পুরুষ থেকে মানব জাতির উদ্ভবের কোন প্রাচীন উপাখ্যান নিহিত আছে এই সংবাদ সূক্তটির মধ্যে — "An old myth of the origin of the human race from a first pair of twins underlies the conversation." বাইবেলে প্রথম পুরুষ 'আদম' এবং প্রথম স্ত্রী 'ইভের' পুত্র ও কন্যার মধ্যে অবৈধবিবাহ ও সন্তান উৎপাদনের কাহিনী যম-যমী সংবাদপাঠে স্বতঃই মনে উদিত হয়।

সরমা-পণি সংবাদ : ঋগ্বেদের দশম মন্ডলের ১০৮ সংখ্যক সূক্তে সরমা ও পণির উক্তি-প্রত্যুক্তি বর্ণিত হয়েছে। পণি নামক দস্যুরা ইন্দ্রের গাভীসমূহ অপহরণ করে আত্মগোপন করেছিল। দেবলোকের দ্যূতি সরমাকে ইন্দ্র গাভীর অনুসন্ধানে প্রেরণ করেন। বহু বিপদ সংকুল পথ অতিক্রম করে অবশেষে সরমা পণিদের সন্ধান পায়। সে জানায় যে, ইন্দ্রের দ্যূতিরূপে সে গোধন নিতে এখানে এসেছে — "ইন্দ্রস্য দূতীরিষিতা চরামি মহ ইচ্ছন্তী পণয়ো নিধীন্ বঃ।" পণিরা তাঁকে প্রথমে উপহাস করে এবং পরে নানা প্রলোভন

দেখায়। সরমা সমস্ত প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করে বলে— "আমি ভাই বা ভাগনী সম্বোধন বুঝি না, ইন্দ্র ও অঙ্গিরার সন্তানেরা গাভী সন্ধানের জন্য আমাকে প্রেরণ করেছেন। তোমরা আত্মরক্ষার জন্য দূরে পলায়ন কর।"

ইউরোপীয় পন্ডিত ম্যাক্সমূলারের মতে — এই বৈদিক উপাখ্যানটি প্রাতঃকালীন প্রকৃতির একটি উপমা মাত্র। সরমা হলেন ঊষা ও দেবগণের গাভী হল সূর্যরশ্মি। তা অন্ধকারের দ্বারা অপহৃত হয়েছে। দেবতা এবং মানুষেরা তাকে উদ্ধারের জন্য ব্যাস্ত এমন সময় দেখা দিলেন ঊষা। তিনি সংবাদ নিয়ে ফিরে এলেন। অবশেষে ইন্দ্র অন্ধকারকে বিনাশ করে সূর্যের রশ্মিরূপ গোধন উদ্ধার করলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়—

"আপনারে দিয়া রচিলি রে কি এ আপনারি আবরণ।
খুলে দেখ্ দ্বার অন্তরে তার আনন্দনিকেতন।" (পূজা-১৮৪)

অগস্ত্য ও লোপামুদ্রার কথোপকথন : অগস্ত্য ও তাঁর পত্নী লোপামুদ্রার কথোপথনের (১/১৭৯) বিষয় অনুসারে রতি বা সম্ভোগই এর দেবতা বলে নির্দিষ্ট হয়েছে। এই সূক্তে মোট ছয়টি ঋকের মধ্যে প্রথম চারটি স্বামী ও স্ত্রীর কথোপকথন এবং শেষ দুটি ঋকে শিষ্যের মন্তব্য কাব্যসৌন্দর্যে ও নাট্যগুণে মন্ডিত এক চিত্তাকর্ষক কাহিনি উপস্থাপিত হয়েছে। উগ্র ঋষি অগস্ত্য উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করে দেবগণের নিকট সত্য আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

অগ্নি ও দেবগণের কথোপথন : ঋগ্বেদের দশম মন্ডলের ৫১, ৫২ এবং ৫৩ সংখ্যক তিনটি সূক্তে অগ্নি ও দেবতাগণের কথোপকথন বর্ণনার ছলে দেবতাদের নিকট অগ্নির উক্তি এবং শেষে অগ্নির প্রতি কৃতজ্ঞ দেবতাদের উক্তি বর্ণিত হয়েছে।

ইন্দ্র-ইন্দ্রানী-বৃষাকপির কথোপকথন : দশম মন্ডলের ১০/৮৬ সংখ্যক সূক্তে ইন্দ্র, ইন্দ্রানী ও ইন্দ্রপালিত বৃষাকপি (পুরুষবানর) এর মধ্যে একটি কৌতুহলোদ্দীপক কথোপকথন পাওয়া যায়। এতে বৃষাকপির প্রতি ইন্দ্রের অত্যধিক স্নেহ ইন্দ্রানী মেনে নিতে পারেন নি। সূক্তটিতে ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে। প্রতিটি মন্ত্রের শেষেই ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব উদ্‌ঘোষিত হয়েছে — "বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তর ঃ" মনে হয়, এই সূক্তটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

সূর্যাসূক্ত : অধ্যাপক Winternitz ঋগ্বেদের দশম মন্ডলের ৮৫ সংখ্যক সূক্তটিকে ও সংবাদ সূক্তের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সূর্য দুহিতা সূর্যের বিবাহ এই মন্ত্রের বিষয়বস্তু। সূক্তটির মন্ত্রসংখ্যা মোট ৪৭টি। অশ্বিনীকুমারদ্বয় এখানে ঘটকের কার্য সম্পন্ন করেছেন। সূক্তটিতে বিবাহ অনুষ্ঠানাদির যে উল্লেখ আছে, সেগুলির সঙ্গে পরবর্তীকালের গৃহ্যসূত্রের সঙ্গে যথেষ্ট তাৎপর্য আছে। তাই ধর্মীয় ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই সূক্তটির গুরুত্ব অনেক।

এছাড়া ঋগ্বেদ সংহিতার অন্যান্য সূক্তগুলির মধ্যে ইন্দ্র-বসুক্র ও তাঁর পত্নীর সংলাপ

(১০/২৮), ইন্দ্র ও মরুতের সংলাপ (১০/৬৫) উল্লেখের দাবী রাখে। ঋগ্বেদের সংবাদ সূক্তগুলি খুব সম্ভবতঃ সমাজের জনগণের মধ্যে ভাসমান গীতিকবিতার অংশ বিশেষ। এইসব উপাখ্যানগুলি পরবর্ত্তীকালে ব্রাহ্মণের বিভিন্ন আখ্যানাংশে, মহাকাব্যে, পুরাণে, বৌদ্ধসাহিত্যে এমন কি ধ্রুপদী সংস্কৃত নাটকগুলিতেও পরিলক্ষিত হয়। তাই সংস্কৃত সাহিত্যে সংবাদসূক্তগুলির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

ধর্মনিরপেক্ষ সূক্ত

ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির তথা একটি সুসভ্য মানবজাতির সর্বাঙ্গীন চিন্তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে ঋগ্বেদে। কাজেই দেবতা সম্পর্কীয় বা ধর্মীয় সত্তা যেমন আছে, তেমনিই আবার ধর্ম নিরপেক্ষ জাগতিক বৈচিত্র্য বিষয়ক কিছু সূক্তও ঋগ্বেদে পরিলক্ষিত হয়।

ঋগ্বেদ মূলত ধর্মমূলক গ্রন্থ হলেও ধর্মনিরপেক্ষ কিছু উল্লেখযোগ্য সূক্তও পাওয়া যায়। ধর্মনিরপেক্ষ এই অর্থে যে, সেগুলিতে দেবতা বিষয়ক ভাবনা মুখ্য নয়। সেই ধরনের সূক্তগুলিকে বলা হয় ধর্মনিরপেক্ষ (Secular hymns) বা লোকবিষয়ক সূক্ত। ধর্মমূলক সূক্তের তুলনায় ধর্মনিরপেক্ষ সূক্ত সংখ্যায় নগণ্য হলেও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে এগুলির মূল্য অসাধারণ।

বিভিন্ন ধরনের ধর্মনিরপেক্ষ সূক্ত : ধর্মনিরপেক্ষ সূক্তগুলির মধ্যে একদিকে যেমন আছে নীতি প্রতিপাদক সূক্ত, ইন্দ্রজালমূলক সূক্ত, নারাশংসী ও দানস্তুতি। অপরদিকে তেমনি আছে সংবাদসূক্ত, সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক সূক্ত ইত্যাদি। এই সূক্তগুলি থেকে তৎকালীন মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালী ও সমাজ জীবনের ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ পরিচয় জানা যায়। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় জানার পক্ষে এই সূক্ত সমূহের মূল্য অসাধারণ।

নীতি প্রতিপাদক সূক্ত : ধর্মনিরপেক্ষ সূক্তের মধ্যে নীতি প্রতিপাদক কয়েকটি সূক্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঋগ্বেদের নবম মন্ডলের ১১২ সংখ্যক সূক্তে পার্থিব বস্তুলাভের বিভিন্ন উপায় বর্ণিত হয়েছে। দশমমন্ডলের ৭১ সংখ্যক সূক্তে জ্ঞানগর্ভ বাক্যের প্রশংসা ও ভাষা শিক্ষার প্রথম পাঠের ইঙ্গিত দেখা যায় এবং ১১৭ সংখ্যক সূক্তে সৎকর্মের মূল্য সম্পর্কে নীতিমূলক মন্ত্র পরিলক্ষিত হয়। এই শ্রেণির সূক্তের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ হল অক্ষসূক্ত (১০/৩৪)। পাশা খেলায় আসক্ত সর্বস্বান্ত এক হতভাগ্য জুয়াড়ীর এক করুণ বিলাপ এই সূক্তের বিষয়বস্তু। পাশাখেলার প্রতি অত্যধিক আসক্তি বশত সর্বস্বান্ত হয়ে কিভাবে সে নিজের ও পরিবারের ক্ষতিসাধন করেছে এবং আত্মীয়স্বজনদের বিরাগভাজন হয়েও পাশাখেলার দুর্বার আকর্ষণ ত্যাগ করতে পারেনি, তার এক বাস্তব চিত্র এখানে অঙ্কিত হয়েছে। সূক্তে দেখা যায় অনুতপ্ত সেই জুয়াড়ী এই শিক্ষা গ্রহণ করেছে যে,

পাশাখেলা বর্জন করে, কৃষিকর্মে মনোনিবেশ করাই শ্রেয়। তাই বলা হয়েছে—"অক্ষৈর্মা দীব্যঃ কৃষিমিৎ কৃষস্ববিত্তে রমস্ব বহু মন্যমানঃ।"

ইন্দ্রজাল বিষয়ক সূক্ত : ঋগ্বেদে ইন্দ্রজাল বিষয়ক কয়েকটি সূক্ত পাওয়া যায়। এরকম সূক্তের সংখ্যা প্রায় তিরিশটি। রোগবিতাড়নের জন্য, দুর্লক্ষণের প্রভাব দূরীকরণের জন্য, বিষের প্রভাব দূর করার জন্য, শত্রুর মূলোৎপাটনের জন্য মন্ত্রগুলি রচিত। এছাড়া শস্যোৎপাদন, সম্পদবৃদ্ধি, নিস্ত্রাকর্ষণ যুদ্ধে জয়লাভ প্রভৃতির জন্য ব্যবহারযোগ্য মন্ত্রও এখানে আছে। ষষ্ঠমণ্ডলের ৭৫ সংখ্যক সূক্তটি মূলত যুদ্ধ সম্পর্কীয়। পরে এটি যুদ্ধ বিষয়ক যাদুমন্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছে বলে মনে হয়। এর কিছু মন্ত্র মহাকাব্যোচিত বীরত্ব ভঙ্গিতে রচিত। অনেক মন্ত্রে আবার ইন্দ্রজালমূলক বর্ণনার বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তিও পরিলক্ষিত হয়।

নারাশংসী ও দানস্তুতিমূলক সূক্ত : ঋগ্বেদের কতকগুলি মন্ত্রে আবার দেবস্তুতির পাশাপাশি মানুষের প্রশংসা করা হয়েছে। অনেক সময় ধনী যজমানের দাক্ষিণ্যে তুষ্ট হয়ে ঋষিরা দানের প্রশংসা করতেন, আবার দাতারও প্রশংসা করতেন। যে সূক্তগুলিতে দাতার প্রশংসা আছে সেগুলিকে বলা হয় 'নারাশংসী' আর যেগুলিতে দানকর্মের প্রশংসা আছে সেগুলিকে বলা হয় 'দানস্তুতি'। এগুলিতে ধর্মমূলক রচনার বৈশিষ্ট্য থাকলেও মূলত এগুলি লৌকিক আচরণের ইঙ্গিতবাহী। কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনা এবং নামের উল্লেখ থাকায় এই সূক্তগুলি ইতিহাসের দিক দিয়েও যথেষ্ট মূল্যবান।

সংবাদসূক্ত : কথোপকথনের আকারে রচিত ঋগ্বেদের সংবাদ সূক্তগুলি ধর্মনিরপেক্ষ রচনার মধ্যে পড়ে। এগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল পুরুরবা এবং উর্বশীর কথোপকথন (১০/৯৫)। চার বছর পুরুরবার সঙ্গে মর্ত্যে বাস করে উর্বশী যখন তাঁকে পরিত্যাগ করতে উদ্যত সেই সময় রাজার সঙ্গে তাঁর উক্তি প্রত্যুক্তি আলোচ্য সূক্তের বিষয়। এছাড়া আছে ইন্দ্র-ইন্দ্রাণী-বৃষাকপির কথোপকথন (১০/৮৬), যম-যমী সংবাদ (১০/১০), সরমা-পণিসংবাদ (১০/১০৮) এগুলিও সংবাদসূক্ত রূপে প্রসিদ্ধ। ঋগ্বেদে এই জাতীয় প্রায় কুড়িটি সূক্ত আছে। একটিতে অগস্ত্য-লোপামুদ্রার (১/১৭৯) কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে। দশমমণ্ডলের ৫১ এবং ৫২ সংখ্যক সূক্তের বিষয়বস্তু হল অগ্নি এবং দেবগণের মধ্যে কথোপকথন। Oldenberg মহোদয় এই সংবাদসূক্তগুলিকে 'আখ্যানসূক্ত' এবং ম্যাক্সমূলার ও সিলভ্যাঁ লেভির মতে এগুলি একধরণের নাটক।

সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক সূক্ত : বিশ্ব সৃষ্টি বিষয়ক কয়েকটি সূক্তকেও ধর্ম নিরপেক্ষ সূক্তের মধ্যে ফেলা যায়। ঋগ্বেদে এই জাতীয় প্রায় ছয়টি সূক্ত পাওয়া যায়, যাদের মধ্যে সৃষ্টির উদ্ভব ও প্রক্রিয়াকে বিষয়বস্তু রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। দশম মণ্ডলের ৭২ সংখ্যক সূক্তে অসৎ থেকে সৎ এর বিবর্তন সম্বন্ধে বলা হয়েছে। রহস্যময় সৃষ্টি ক্রিয়ার বিস্তৃত বর্ণনা

আছে নাসদীয় সূক্তে। এই সূক্তের প্রভাব পরবর্তী দর্শনশাস্ত্রে সুস্পষ্ট।

বিবাহবিষয়ক সূক্ত : ধর্মনিরপেক্ষ সূক্তের আর একটি বিখ্যাত সূক্ত হল দশমমণ্ডলের বিবাহ বিষয়ক সূক্ত। এখানে সোমের সঙ্গে সূর্যকন্যা সূর্যার বিবাহ বর্ণিত হয়েছে। সূক্তটি সূর্যাসূক্ত নামেও প্রসিদ্ধ। এই সূক্ত থেকে প্রাচীন ভারতের বিবাহ পদ্ধতি সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

বনানী সংক্রান্ত সূক্ত : দশম মণ্ডলের ১৪৬ সংখ্যক সূক্তে বনানীর বর্ণনা ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক শূন্য হলেও যথেষ্ট বাস্তবোচিত। অপর একটি সূক্তে ব্যক্ত হয়েছে সেকালে নানা শ্রেণির মানুষের জীবিকার বিষয়।

ভেকসূক্ত : সপ্তম মন্ডলের ১০৩ সংখ্যক সূক্তটি ভেক সূক্ত নামে প্রসিদ্ধ। এই সূক্তে একটি ভেকের শব্দ অন্য ভেকের দ্বারা অনুকৃত হওয়ার ঘটনাকে গুরু শিষ্যের পাঠদানও পাঠগ্রহণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এখানে আবার ভেক রবের সঙ্গে বেদপাঠরত ব্রাহ্মণের উচ্চারিত ধ্বনির সাদৃশ্য কল্পিত হয়েছে। অধ্যাপক Bloomfield মনে করেন যে, বৃষ্টি আনয়নের জন্যই এখানে ভেকগণকে আহ্বান করা হয়েছে।

হেঁয়ালি ধরনের সূক্ত ঃ ঋগ্বেদের কয়েকটি সূক্ত অনেকটা হেঁয়ালি ধরনের। যেমন—৮/২৯ সংখ্যক সূক্তে নাম উল্লেখ না করে অনেক দেবতার বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া ১/১৬৪ সংখ্যক সূক্তের বাহান্নটি মন্ত্রই চির রহস্যাবৃত।

ধর্মনিরপেক্ষ অন্যান্য সূক্ত : এছাড়া আরও কতকগুলি ধর্মনিরপেক্ষ সূক্ত পাওয়া যায়, যেমন—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার রীতিনীতি বর্ণনা করে ঋগ্বেদের কয়েকটি সূক্ত রচিত হয়েছে। এদের মধ্যে সর্বশেষ সূক্তটি (১০/১৮) লৌকিক রচনার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। আবার ১/১৬২ সূক্তে অশ্বমেধ যজ্ঞের বর্ণনা, ১০/১৭৩ সূক্তে রাজার মাহাত্ম্য বর্ণনা, ১০/১৫৪ সূক্তে সপত্নীবাধক ভেষজের বর্ণনা, ১০/১৫ সূক্তে পিতৃলোক, ১০/৩৩ সূক্তে আত্মীয়ের মৃত্যুজনিত দুঃখ বর্ণিত হয়েছে ইত্যাদি।

ধর্মনিরপেক্ষ সূক্তগুলির গুরুত্ব : ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে ধর্মনিরপেক্ষ সূক্তগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। পণ্ডিতেরা একদিকে যেমন পরবর্তী কালের সংস্কৃত মহাকাব্যের সঙ্গে এগুলির যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন। অন্যদিকে তেমনি নাটকের আদি উৎস বলেও এগুলির ব্যাখ্যা করেছেন। ধর্মনিরপেক্ষ এই সূক্তগুলির বর্ণনারীতি পরবর্ত্তীকালে মহাকাব্যে অনুসৃত হয়েছে। কথোপকথনমূলক সংবাদসূক্তগুলি সংস্কৃত নাটকের সংলাপ রচনায় অনুসৃত হয়েছে। ওল্ডেনবার্গ এগুলিকে 'গাথাজাতীয়' মহাকাব্যের রচনার উৎস বলে অভিহিত করেছেন। অপরদিকে ম্যাক্সমূলার, সিলভ্যাঁ লেভি প্রমুখ পণ্ডিতগণ সংবাদসূক্তগুলিকে নাটকের লক্ষণাক্রান্ত বলে চিহ্নিত করেছেন। উভয় মতের সমন্বয় সাধন করে অধ্যাপক Winternitz বলেন—প্রাচীন গাঁথা জাতীয় রচনাগুলি মহাকাব্য এবং নাটক

উভয় শ্রেণির রচনারই উৎস। এগুলি মূলতঃ মহাকাব্যধর্মী ও অংশত নাট্যধর্মী—"This ancient ballad poetry is the source both of the epic and of the drama." ঋগ্বেদে ধর্মনিরপেক্ষ সূক্তগুলিতে কবিত্বের যে নিদর্শন আছে তা পরবর্তীকালের মহাকাব্য রচনার ক্ষেত্রকে প্রশস্ত করেছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। সংবাদ সূক্তের মধ্যে যে নাট্যরচনার বীজ নিহিত আছে সে কথাও সত্য। যেমন—পুরুরবা-উর্বশীর কথোপকথনের বিষয়কে অবলম্বন করেই কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশীয়' নাটক রচিত হয়েছে। সুতরাং বলা যায় যে, বৈদিক সাহিত্যের ধর্মনিরপেক্ষ সূক্তে বিশেষ করে সংবাদসূক্তের মধ্যে মহাকাব্য ও নাট্য রচনার বীজ যে উপ্ত হয়েছিল তা লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হয়েছে।

ঋগ্বেদীয় ধর্মনিরপেক্ষ লৌকিক বা ঐহিকসূক্তগুলির আলোচনা থেকে প্রাচীন ভারতীয় আর্যসভ্যতা ও আর্যসংস্কৃতির বহু তথ্য আমরা জানতে পারি। এগুলি পরবর্ত্তীকালের ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করেছে।

দার্শনিক সূক্ত

পণ্ডিতদের মতে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের সর্বপ্রথম লিখিত সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায় ঋগ্বেদ সংহিতায়। প্রথম অবস্থায় যা ছিল বহুদেবতাবাদ, ক্রমশঃ তা অতিদেবতাবাদের মধ্য দিয়ে একেশ্বরবাদে পরিণত হয়েছে। ব্যবহারিক জীবনের আশা-আকাঙ্খার চরিতার্থতার জন্যে যে যজ্ঞীয় ধর্মকর্মের সূত্রপাত ঘটেছিল, ঋগ্বেদ সংহিতার মধ্যেই তা ক্রমশ দার্শনিক জিজ্ঞাসায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

দার্শনিকসূক্ত কি : ঋগ্বেদের কতকগুলি সূক্তে ধর্ম, জগৎ ও জীবন, সৃষ্টি রহস্য, একেশ্বরবাদ প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চতর দার্শনিক চিন্তার প্রভাব সুস্পষ্ট। সমালোচকেরা এই ধরনের সূক্তগুলিকে দার্শনিকসূক্ত বা Philosophical Hymns নামে আখ্যাত করেছেন। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত অধ্যাপক Winternitz-এর মতে—"But there are about a dozen of hymns in the Rgveda which we can designate as philosophical hymns." এদের সংখ্যা অল্প হলেও তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী।

দার্শনিক চিন্তার সূত্রপাত : ঋগ্বেদের দার্শনিক চিন্তা সমৃদ্ধসূক্তগুলির অধিকাংশই দশমমণ্ডলে রয়েছে। অবশ্য অন্য মন্ডলেও কিছু কিছু দার্শনিক তথ্য সমৃদ্ধ সূক্ত পাওয়া যায়। যেমন—প্রথম মন্ডলের ১৬৪ সংখ্যক সূক্তে সেই বিখ্যাত মন্ত্রটি পাওয়া যায়, যেখানে বলা হয়েছে—

"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।" ঋগ্বেদের এই মন্ত্রটিতেই বহুদেবতাবাদের মধ্যে এক দেবতাবাদের সূচনা হয়েছে।

কিছু দার্শনিক সূক্তের আলোচনা

ইন্দ্রসূক্ত (২/১২) : ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের ইন্দ্রসূক্তে দার্শনিক চিন্তার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। যেখানে প্রতিটি মন্ত্রে এই হিরণ্ময় দেবতার অস্তিত্ব ও মহিমা দৃঢ়ভাবে প্রতিপাদিত হয়েছে, 'স জনাস ইন্দ্রঃ'—এই ধ্রুব পদের দ্বারা। ইন্দ্রের এই মহত্ত্ব কীর্তনের অন্তরালে নিহিত আছে সেই সর্বব্যাপী পরম সত্তার ধারণা।

পুরুষসূক্ত (১০/৯০) : ঋগ্বেদে বহু আলোচিত দার্শনিক সূক্তগুলির মধ্যে অন্যতম হল পুরুষসূক্ত। এই সূক্তে জগৎ স্রষ্টার বিশ্বব্যাপী রূপের আভাস স্পষ্ট। সৃষ্টির সূচনায় পুরুষ কিভাবে নিজেকে সমর্পণ করলেন, কিভাবে সেই একক সত্তা স্থাবর জঙ্গামাত্মক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিণত হল তার কাব্যধর্মী বর্ণনা আছে এই সূক্তে। জগতের যা কিছু সৃষ্ট পদার্থ সবই এই পুরুষ—

"পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চভব্যম্"। তাঁর মন থেকে চন্দ্র, চক্ষু থেকে সূর্য, মুখ থেকে ইন্দ্র ও অগ্নি এবং প্রাণ থেকে বায়ুর উৎপত্তি হয়েছে। বৈদিক ঋষিকবিদের যথার্থ উত্তরসূরী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়—

"আছ অনল অনিলে চির নভোনীলে
ভূধর সলিলে গহনে
আছ বিটপী লতায়
জলদেরই গায়,
শশি তারকায় তপনে।"

উপনিষদের যুগে এই চিন্তাই ব্রহ্মবাদে পরিণত হয়েছে।

হিরণ্যগর্ভসূক্ত (১০/১২১) : ঋগ্বেদ সংহিতায় বহুদেবতার উল্লেখ আছে। সাধারণ মানুষ এই দেবতারণ্যে বিভ্রান্ত, দিশেহারা ও সংশয়ী হয়ে উঠেছিল। সেই সংশয়ের প্রকাশ রয়েছে হিরণ্যগর্ভ সূক্তে। বহুদেবতার অস্তিত্বে সন্দিহান ঋষি এই সূক্তে হিরণ্যগর্ভকেই জগৎ প্রপঞ্চের সৃষ্টিকর্তা ও পালন কর্তারূপে বর্ণনা করেছেন—"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।" ডঃ রাধাকৃষ্ণণ বলেছেন যে, এই মন্ত্রটিতে আমরা একেশ্বরবাদের বীজরূপে অতিদেবতাকে পাই।

বাক্ বা দেবীসূক্ত (১০/১২৫) : অম্ভৃণ্ ঋষির কন্যা বাক্ বিরচিত পরমাত্ম সূক্ত বা দেবীসূক্ত নামেই অধিক পরিচিত। নারী ঋষি বাক্ এখানে সমস্ত দেবতার সঙ্গে নিজের একাত্মতা ঘোষণা করেছেন—তিনি বলেছেন যে, তিনি সমস্ত প্রাণীর মধ্যে আবিষ্ট আছেন, তিনি দ্যুলোক ও ভূলোকে স্পর্শ করে থাকেন—"অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।" পরবর্তী বহু ভারতীয় দর্শনে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার একাত্মতা ঘোষিত হয়েছে। তাছাড়া উপনিষদ ও বেদান্তে ব্যক্ত দার্শনিক ভাবনার উৎসরূপে ও একে গ্রহণ করা যায়। তাই অনেকে এই সূক্তটিকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলে মনে করেন।

রাত্রিসূক্ত (১০/১২৭) : রাত্রির রূপ বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে দেবীরূপিণী মহাশক্তির মাহাত্ম্য

কীর্তিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ঋষি কুশিক বলেছেন—

"ওর্বপ্রা অমর্ত্যা নিবতো দেব্যুদ্বতঃ।
জ্যোতিষা বাধতে তমঃ।।"

দেবীরূপিণী রাত্রি সর্বত্র ব্যাপ্ত রয়েছেন। তিনি আলোকের দ্বারা অন্ধকারকে নাশ অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞতারূপ তমিস্রারই বিনাশ করেছেন।

নাসদীয়সূক্ত (১০/১২৯) : জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাই দার্শনিক চিন্তার সূত্রপাত ঘটায়। এই ধরণের জিজ্ঞাসার অবতারণা দেখতে পাই নাসদীয় সূক্তে। সৃষ্টি বিষয়ে বৈদিক ঋষিদের চিন্তা যে কতখানি সূক্ষ্মতা অর্জন করেছিল তার জ্বলন্ত প্রমাণ এই সূক্তটি। সৃষ্টির পূর্বে সৎ-অসৎ, মৃত্যু-অমৃতত্ত্ব, দিন-রাত্রি কোন কিছুই ছিল না। সমস্ত স্থান ছিল অন্ধকার ও জলে আচ্ছন্ন। বৈদিক ঋষির এই অনুভূতিতে ফুটে উঠেছে সর্বব্যাপী এক মহাশূন্যতার চিত্র—

"নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নো ব্যোমো পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য সর্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্।।"

সূক্তটিকে বলা হয়েছে, সৃষ্টির পূর্বে যা আছে তাও ছিল না, যা নেই তাও ছিল না। তারপর তপস্যার প্রভাবে একটি সত্তার আবির্ভাব হল। সেই বুদ্ধিযুক্ত সত্তায় কামনার উদ্ভব হল। সেই কামনা থেকেই সৃষ্টি হল উদ্ভূত। নাসদীয় সূক্তে এই তত্ত্বোপলব্ধি বর্ণিত হয়েছে।

অঘমর্ষণ সূক্ত (১০/১৯০) : সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই সূক্তে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। প্রথমে ঋত ও সত্য, পরে রাত্রি ও সমুদ্রের উদ্ভব হয়েছে। এই সমুদ্র থেকে সংবৎসর সৃষ্টি হয়েছে। এরপর যথাকালে সৃষ্টিকর্তার দ্বারা সূর্য, চন্দ্র, স্বর্গ, মর্ত্য এবং আকাশ সৃষ্টি হয়েছে—

"সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথ স্বঃ।।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়—

"লক্ষ কোটি গ্রহতারা আকাশে আকাশে
বহন করিয়া চলে প্রকান্ড সুষমা,
ছন্দ নাহি ভাঙে তার সুর নাহি বাধে,
বিকৃতি না ঘটাল স্খলন," (রোগশয্যায়-২১)

বিশ্বকর্মাসূক্ত (১০/৮১) : এই সূক্তে বলা হয়েছে যে, বিশ্বকর্মা দ্যাবাপৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি বিধাতা। তিনি আমাদের জন্মদাতা পিতা। তিনিই একমাত্র আছেন এবং সকল দেবতার নামধারণ করেন। এই বর্ণনা থেকে মনে হয় একই শক্তির উদ্দেশ্যে ঐ সূক্ত দুটি রচিত হয়েছিল। তিনিই পরম শক্তি বা ঈশ্বর। তাঁকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। যখন তাঁর স্রষ্টারূপকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, তখন তিনি বিশ্বকর্মা,

আর যখন তাঁর প্রভূত শক্তির উপর জোর দেওয়া হয়েছে তখন তিনি প্রজাপতি। এভাবে একেশ্বরবাদী চিন্তা বীজাকারে ঋগ্বেদে আবির্ভূত হয়েছিল।

বীজাকারে নিহিত এই দার্শনিক চিন্তাধারা ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়ে উপনিষদে পল্লবিত হয়েছে। এই সূক্তগুলিতে একদিকে যেমন সৃষ্টি বিষয়ে আর্যঋষিদের ধ্যান-ধারণা প্রকাশিত হয়েছে। অপরদিকে তেমনি বহুর মধ্যে একক, বহুদেবতার মধ্যে একক মহাসত্তার আভাস অভিব্যক্ত হয়েছে। এই সকল দিক থেকে ঋগ্বেদের দার্শনিক সূক্তগুলির মূল্য অপরিসীম। পন্ডিত প্রবর ম্যাক্সমূলারের কথায়—"The great divinity of the Gods in one."

ঋগ্বেদের সমাজ

ঋগ্বেদের কয়েক সহস্র মন্ত্রে তৎকালীন সমাজের সুন্দর চিত্র ফুটে উঠেছে। তৎকালীন সমাজ, সংস্কৃতি ও জীবন যাত্রার প্রণালী প্রভৃতির যে বিবরণ ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলিতে পাওয়া যায়, তা দুর্লভ ঐতিহাসিক দলিলের মত। তাই দার্শনিক Winternitz বলেছেন—"The Rgveda is anything but a text book of morals". ঋগ্বেদীয় যুগের সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে নিম্নে আলোচিত হল।

রাজতন্ত্র : ঋগ্বেদীয় যুগে রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। রাজাই ছিলেন রাজ্যের কর্ণধার। ঋগ্বেদে বহু রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজার উদ্দেশ্যে দুটি সূক্ত ও ঋগ্বেদে পাওয়া যায় (১০/১৭৩, ১০/১৭৪)। ৭/৪৮ সংখ্যক সূক্তে রাজা দেববাণ, তাঁর পুত্র রাজা পিজবন এবং তাঁর পুত্র রাজা সুদাসের সঙ্গে দশজন রাজার সমবেতভাবে যুদ্ধ করার বর্ণনা আছে। এছাড়া পুরুষানুক্রমে রাজাদের রাজ্যশাসনের কথাও বেদে কীর্তিত হয়েছে। বৈদিক যুগ থেকে গুপ্ত সাম্রাজ্য পর্যন্ত ব্রাহ্মণগণই প্রধানত মুখ্যমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করে গেছেন।

সামাজিক জীবন : ঋগ্বেদীয় সমাজ ছিল পিতৃতান্ত্রিক। সেই যুগে একান্নবর্ত্তী পরিবার যেমন ছিল, তেমনি পৃথক পৃথক পরিবারও ছিল। পরিবারের প্রধানতম পুরুষ গৃহপতি বা প্রধান রূপে গণ্য হতেন। সমাজে নারীরা মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিতা ছিলেন। পৈতৃক সম্পত্তি ছেলে, ছেলের অভাবে মেয়েরা পেত। এবং তৎকালীন সমাজে দত্তক প্রথার প্রচলনও ছিল।

বর্ণব্যবস্থা : ঋগ্বেদের যুগে বর্ণবিভেদের কোনরূপ কঠোরতা সমাজে প্রচলিত ছিল না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণের স্পষ্ট উল্লেখ দশম মন্ডলের পুরুষ সূক্তের একটি মন্ত্রে পাওয়া যায়—

"ব্রাহ্মনোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূরাজন্যঃ কৃতঃ।

উরু তদস্য যদ্‌বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়তঃ ।।"

ঋগ্বেদের যুগে জাতি বলতে কেবল বোঝাত—আর্য ও অনার্য বা দাস বা দস্যুকে প্রথম দিকে উভয় বর্ণের মধ্যে শত্রুতা থাকলেও পরে অনার্যরা ও সমাজের অঙ্গীভূত হয়েছিল বলে মনে হয়। ১০/৬২ সূক্তে যদু ও তুর্বণ নামে দুজন দাস রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদীয় যুগের শেষভাগে সমাজে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত হয়েছিল বলে মনে হয়। তবে অনেকের মতে এই জাতিভেদ প্রথা জন্মগত ছিল না, ছিল কর্মগত এবং কেনরূপ অস্পৃশ্যতা ছিল না। প্রাচীন আর্যদের জীবন ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রমে বিভক্ত ছিল।

বাসস্থান : ঋগ্বেদীয় যুগে আর্যরা সাধারণতঃ বাঁশ, খড়, মাটি প্রভৃতি দিয়ে গৃহ নির্মাণ করে গ্রামে বসবাস করতেন। ঘরগুলি মাটির, কাঠের, ত্রিতলগৃহ, প্রাসাদ, প্রস্তর ও লৌহনির্মিত কয়েকটি নগরেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে ঋগ্বেদের ৫/৬২, ৭/৮৮ ও ১০/৩৪ সংখ্যক সূক্তে বরুণদেব ও ধনী ব্যক্তিদের অট্টালিকার এবং ১/১৭৩ সূক্তে নগরপতির উল্লেখ তারই প্রমাণ।

জীবিকা ও বৃত্তি : বৈদিক মানুষের প্রধান জীবিকা তথা অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি ছিল কৃষি। এবং কৃষিকার্যের পদ্ধতিও ছিল যথেষ্ট উন্নতমানের। ঋগ্বেদের বহু স্থলেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়, যেমন—কৃষীবল (চাষী), সীর (লাঙ্গল), বলীর্বদ, সীতা (কর্ষণযোগ্যভূমি) প্রভৃতির উল্লেখ। তন্ডুল জাতীয় শস্যের মধ্যে যবের উল্লেখ একাধিকবার পাওয়া গেলেও গমের উল্লেখ নেই। ১০/৯৪ সূক্তে ব্রীহি বা ধান্যের উল্লেখ আছে কৃষির মতোই। গৃহপালিত গরু, ঘোড়া, উট, ছাগ ও মেষ পালন তাদের কাছে মূল্যবান জীবিকা বা সম্পদ ছিল। গোচারণের জন্য সংরক্ষিত ভূমি ছিল। গাড়ী টানা, লাঙল টানা ও দুধের জন্য গোরুই সবচেয়ে বড় সম্পদ রূপে গণ্য হত। ছাগ মাংস দিয়ে প্রস্তুত যজ্ঞের পুরোডাশ পুষাদেবতার প্রিয় খাদ্য রূপে গণ্য হত। সমাজে ধনী-দরিদ্রের শ্রেণিভেদ ছিল এবং দরিদ্রকে দান করার জন্য ধনীদের উৎসাহ দেওয়া হত। ঋগ্বেদে ভিষক (চিকিৎসক), বাসোবায় (তাঁতী), তষ্টা (ছুতোর), কার্মার (কামার), দ্রবি (স্বর্ণকার), মালাকার, নাপিত, বারাঙ্গনা প্রভৃতি নানা পেশার মানুষের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং পতিতাবৃত্তি ও সে যুগে ছিল বলে মনে হয়।

খাদ্য ও পানীয় : বৈদিক যুগে যব এবং যবজাত দ্রব্যই ছিল প্রধান খাদ্য। আর্যগণ প্রধানত মাংসাশী ছিলেন। তারা বৃষমাংস, অশ্বমাংস, ছাগমাংস ও মেষমাংস ভোজন করতেন। গোদুগ্ধ ছিল আর্যদের প্রিয়। পানীয় হিসাবে সুরা, সোমরস এবং মধু আর্যদের প্রিয় ছিল। যজ্ঞে ও এগুলি ব্যবহার হতো। ঋগ্বেদের ৬/৯ সূক্তে বস্ত্রবয়নের উল্লেখ আছে। তাছাড়া ১০/২৬ সূক্তে মোষের লোমের বস্ত্রের উল্লেখ আছে। পুরুষেরা ধুতি ও উত্তরীয় এবং নারীরা পোশাক ছাড়া কোমরবন্ধনী, সোনা, রূপা ও দামী পাথরের গয়না ব্যবহার

করত। এছাড়া বিভিন্ন প্রসাধনী দ্রব্য ও নারীরা ব্যবহার করত।

ব্যবসাবাণিজ্য : ঋগ্বেদে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য সমুদ্রযাত্রার কথা পাওয়া যায়। কাঠ খোদাই করে নৌকা প্রস্তুত করার বিদ্যাও বৈদিক আর্যরা আয়ত্ত করেছিলেন। এছাড়া রথ নির্মাণ, অস্ত্র নির্মাণ বিদ্যাতে ও তাঁরা পারদর্শী ছিলেন। বেদের বহু সূক্তেই লৌহনির্মিত বজ্রাদি অস্ত্রের উল্লেখ আছে। লৌহ শিল্পের মত চর্মশিল্প, বয়নশিল্প, স্বর্ণশিল্প প্রভৃতিও আর্যরা আয়ত্ত করেছিলেন তার প্রমাণ ঋগ্বেদের বহু মন্ত্রে পাওয়া যায়। সে যুগে দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ে যে সবসময় মুদ্রা ব্যবহার করা হত তা-নয়। দ্রব্যাদি প্রধানতঃ বিনিময় প্রথার বাণিজ্য চলত। গাভীর দ্বারাও অনেক সময় বিনিময় মূল্য নির্ধারিত হত। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে সোম যাগের বর্ণনায় গোবৎসের বিনিময়ে, সোমলতা ক্রয়ের অনুষ্ঠানের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের কোথাও ও কোথাও 'নিষ্ক' শব্দটির প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। যার অর্থ সুবর্ণ নির্মিত কোন নির্ধারিত মূল্যের আভরণ বা মুদ্রাকে বোঝাত।

আমোদ-প্রমোদ : আমোদ-প্রমোদের জন্য আর্যদের মধ্যে নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রচলিত ছিল। বাদ্য যন্ত্রের মধ্যে দুন্দুভি, বীণা, বংশী ও ঢোলকের নাম পাওয়া যায়। জনগণের আনন্দ বিধানের জন্য অভিনয়েরও প্রচলন ছিল বলে মনে হয়। তৎকালীন সমাজে দ্যূতক্রীড়ার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। ঋগ্বেদের ১০/৩৪ সংখ্যক সূক্তটিতে অক্ষক্রীড়ার কুফলের মর্মস্পর্শী চিত্র অঙ্কিত হলেও পাশাখেলা প্রাচীন আর্যদের কাছে একটি বিশিষ্ট আমোদের খেলা ছিল। তাছাড়া প্রতিযোগিতামূলক রথের দৌড়, ঘোড়দৌড়, মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতি ছিল জনপ্রিয় আমোদক্রিয়া। পাশাখেলায় আসক্ত ব্যক্তির মত অসাধু ব্যক্তি বৈদিক সমাজে আরও বেশ কিছু ছিল। স্তেয় বা তস্কর, মদ্যপায়ী ও দস্যুর উল্লেখ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। সমস্ত যুগেই সমাজে কিছু না কিছু সাধু ও অসাধু উভয়বিধ লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বৈদিক সমাজে কিছু অসাধু লোক থাকলেও ধর্মপরায়ণ লোকের সংখ্যাই ছিল অধিক।

বিবাহ : ঋগ্বেদীয় যুগে দাম্পত্য সম্পর্কের আদর্শ ছিল খুবই ঊর্ধ্বে। ১০/৮৫ সংখ্যক সূক্তে বিবাহ বন্ধনের গভীরতা, পবিত্রতা এবং গৃহে ও সমাজে নারীর স্থান ছিল ঊর্ধ্বে। স্বামী নির্বাচনে নারীর স্বাধীনতা ছিল। দেবরের সঙ্গে বিধবা বিবাহের উল্লেখ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। তাছাড়া সে সময় পণপ্রথা ও বহুবিবাহ প্রথার প্রচলনও ছিল।

নারীর স্থান : ঋগ্বেদের যুগে সমাজে নারীর স্থান যথেষ্ট উন্নত ও মর্যাদাকর ছিল। পুরুষ প্রধান বৈদিক সমাজে সামাজিক অধিকারে নারী পুরুষের সমান মর্যাদা ছিল। শুধু তাই নয়, নারীরা একত্রে বসে যজ্ঞ করত এবং তাঁরা ঋষির সমপর্যায়ে এসে বেদের মন্ত্র সংকলন ও রচনার অধিকারী হয়েছিলেন। বৈদিক সংহিতায় এইরূপ বহু বিদূষী মহিলার পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁদের মধ্যে অন্যতমা হলেন — গার্গী, মৈত্রেয়ী, কাত্যায়নী, লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা, অপালা, ঘোষা, সাবিত্রী ইত্যাদি। বৈদিক যুগে নারীরা নানাবিধ শিল্প ও

ললিতকলায় সুনিপুণা ছিলেন। তাছাড়া যুদ্ধ বিদ্যার ক্ষেত্রেও তাঁরা অপূর্ব বীরত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। সম্ভবতঃ বৈদিকোত্তর যুগ অপেক্ষা বৈদিক যুগেই নারী স্বাধীনতা ছিল অধিক ও সমাজে নারীদের ভূমিকা ছিল গৌরবান্বিত। তাই একটি উক্তি ভারতীয় সমাজে আজও প্রচলিত — "সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে।" অবশ্য বৈদিক যুগের শেষভাগে নারীর মর্যাদা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে।

ঋগ্বেদীয় যুগে সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছিল। এ প্রসঙ্গে ড. রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের অভিমতটি স্মরণীয় — "The Rgvedic civilization was based-on plain living and high thinking" প্রাচীন ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতি, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি জানতে গেলে ঋগ্বেদের চর্চা একান্ত অপরিহার্য।

বৈদিক দেবতা

ঋগ্বেদ মূলতঃ ভারতীয় আর্যজাতির প্রধান ধর্মমূলক গ্রন্থ। এই সংহিতার কয়েকটি সূক্ত বাদ দিলে অধিকাংশই প্রাকৃতিক শক্তির দৈবীভাবনায় সমৃদ্ধ, অপরূপ কল্পনার বিচিত্র প্রকাশ। অনায়ত্ত প্রাকৃতিক শক্তিকে ঐশী শক্তিরূপে কল্পনা করে তার আরাধনায় আত্মনিয়োগ করেছেন বৈদিক ঋষিগণ। ঋক্‌সংহিতার মন্ত্রগুলি প্রধানত দুভাগে বিভক্ত — স্তুতি ও প্রার্থনা। স্তুতি শ্রেণির মন্ত্রে দেবতার নাম, রূপ ও কর্মের উল্লেখ করে দেবতার স্তব করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় শ্রেণির মন্ত্রে দেবতার কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে ধন, আয়ু, শক্তি, পুত্র ইত্যাদি। Winternitz সাহেব বলেছেন যে, ঋগ্বেদের স্তোত্র গুলিতে দেবতা সৃষ্টির প্রক্রিয়ার সাক্ষাৎ মেলে এবং তাই স্তোত্রগুলি অত্যন্ত মূল্যবান। পৃথিবীর আদিম ধর্মগুলির উৎপত্তির ইতিহাস আমরা ঋগ্বেদে খুব সুন্দরভাবে দেখতে পাই।

দেবতাতত্ত্ব : আচার্য যাস্ক তাঁর 'নিরুক্ত' গ্রন্থে 'দেব' এবং 'দেবতা' শব্দদুটির একই অর্থ করেছেন। তিনি 'দেব' শব্দের দ্বারা তিনটি অর্থ করেছেন — যাঁরা ঐশ্বর্য দান করেন এবং আমাদের ঈপ্সিত বস্তুগুলি দান করেন, তেজোময় বলে যাঁরা পদার্থগুলিকে প্রকাশিত করেন এবং যাঁরা সাধারণত দ্যুলোকে অবস্থান করেন — তাঁরাই দেবতা। শৌনকাচার্যের 'বৃহদ্দেবতা' গ্রন্থে দেবতাতত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। ঋগ্বেদের সূক্তগুলিতে ধর্মীয় চিন্তাধারায় অনুসরণ করলে দেবতা তত্ত্বের এক বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বহুদেবতাবাদ ও অতিদেবতাবাদ এর মধ্য দিয়ে এক দেবতাবাদ এ উত্তরণ ঘটেছে বৈদিক দেবতাতত্ত্বের।

প্রাকৃতিক রূপের মূর্তরূপ : ঋগ্বেদের দেবতত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে, অধিকাংশ দেবতাই কোন না কোন প্রাকৃতিক শক্তিতে জীবিত সত্ত্বার আরোপিত মহিমময় প্রকাশ। প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হতেন সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা। যেমন — প্রকৃতির জ্বলন্ত সূর্য, স্নিগ্ধ চন্দ্র, প্রজ্বলিত যজ্ঞের অগ্নি, বিদ্যুৎ, তারকাখচিত রাত্রির আকাশ, হাস্যময়ী

উষা, কলকল্লোলিনী নদ-নদী, শস্য শ্যামলা বসুন্ধরা প্রভৃতি। তেমনি আবার এই প্রকৃতিরই ভয়ঙ্কর বিধ্বংসী রূপের প্রকাশে ভয় ও বিস্ময়ে হতবাক্ হতেন তাঁরা। এই সমস্তই ঋষিদের মনে আনন্দ-বিস্ময়-ভয় ও বিহ্বলতার সঞ্চার করত। এই সবেরই অন্তরালে অমোঘ দৈবীশক্তির প্রচ্ছন্ন প্রকাশ অনুভব করতেন ঋষিরা। ধীরে ধীরে নানা ঋক্‌মন্ত্রে এই সকল প্রাকৃতিক শক্তি বিভিন্ন দেবতায় রূপান্তরিত হয়েছে। Winternitz বলেছেন — "Only gradually is accomplished in the songs of the Rgveda itself, the transformation of these natural Phenomena into mythological figures, into Gods and God-desses". এভাবেই সূর্য, সোম, অগ্নি, মরুদ্‌গণ, বায়ু, ঊষা, পৃথিবী, পর্জন্য, রাত্রি প্রভৃতি দেবতাদের নাম থেকেই আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, প্রাকৃতিক শক্তি ছিল তাদের উৎস। প্রাকৃতিক শক্তিগুলির উপর ব্যক্তিত্ব আরোপের ফলেই যে এইসকল দেবতার সৃষ্টি হয়েছে তা নিঃসংশয়ে বলা যায়। Winternitz বলেন — "So the songs of the Rgveda prove indisputably that the most prominent figures of mythology have proceeded from personifications of the most striking natural phenomena".

কিছু পৌরাণিক দেবতা আছেন যাঁদের নাম থেকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করা যায় না যে তাঁরা কোন প্রাকৃতিক শক্তির ইঙ্গিত বহন করেছেন। এই সমস্ত দেবতার মূল প্রাকৃতিক পরিচয় কিছুটা বিলুপ্ত হলেও তাঁদের শক্তিমত্তা ও অলৌকিক কার্যাবলী দ্বারা তাঁদের মূল পরিচয় আবিষ্কার করা যেতে পারে। এই শ্রেণির দেবতারা হলেন ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, অদিতি, বিষ্ণু, পূষন, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, রুদ্র প্রভৃতি। ক্রমশঃ এঁরা দেবতার নামে রূপান্তরিত হয়েছেন। মহর্ষি কাত্যায়ন সর্বানুক্রমণীতে বলেছেন সকল দেবতার মূল হলেন সূর্য। অন্যান্য দেবতাগণ এই সূর্যেরই বিভূতিমাত্র। ইন্দ্র, অগ্নি, মিত্র, বরুণ, হিরন্যগর্ভ একই সত্তআর ভিন্ন ভিন্ন নাম — "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি"। বৈদিক ঋষিরা এক ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সদা সচেতন ছিলেন। সমস্ত দেবতাকে এই একেরই বিভিন্ন প্রকাশ রূপে তাঁরা কল্পনা করেছেন। বহু ঈশ্বরবাদ ঋগ্বেদের আপাত প্রতীতিমাত্র।

ইন্দ্র, বরুণ, রুদ্র, অদিতি এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রকৃতপক্ষে কোন্ প্রাকৃতিক শক্তির নির্দেশক তা নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে এখনও যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। মতভেদ সত্ত্বেও বিখ্যাত Mythologist গণ একথা মেনে নিয়েছেন যে বৈদিক দেবতাদের অধিকাংশই এসেছেন প্রাকৃতিক শক্তি থেকে অর্থাৎ "বৈদিক দেবতারা হলেন প্রাকৃতিক রূপেরই মূর্তরূপ"।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে আবার কিছু দেবতা আছেন যাঁরা মূর্তিবিহীন ভাবমাত্র। এঁরা হলেন — শ্রদ্ধা, মন্যু প্রভৃতি। আরও কিছু দেবতা ঋগ্বেদে গুরুত্ব পেয়েছেন। এই সমস্ত দেবতাকে অনেকে 'lower mythology' বলেছেন। যেমন — ঋভু, অপ্সরা, গন্ধর্ব

প্রভৃতি। এঁরা যথাক্রমে ভূত, সমুদ্র, পর্বত প্রভৃতিতে অধিষ্ঠান করেন এবং বন প্রভৃতির আত্মাস্বরূপ। বর্তমান যুগে ও যে একখন্ড প্রস্তর বা একটি প্রাচীন বৃক্ষকে গ্রাম দেবতা হিসাবে পূজা করতে দেখা যায় তার ও উৎস সুদূর বৈদিক যুগেই।

উপরি উক্ত আলোচনা থেকে একটা কথা বলা যায় যে, ঋগ্বেদের দেবতা অর্থে বুঝি পৃথিবী বা অন্তরীক্ষ বা দ্যুলোকের এমন সব প্রাকৃতিক বিষয়, যাঁদের মধ্যে শক্তির প্রকাশ দেখে ঋষিরা তাঁদের উপর দেবত্ব আরোপ করেছেন। মানুষের মনের শিল্পশালায় দেবতা নির্মাণের এই সহজসরল অনাড়ম্বর পদ্ধতি আমাদেরকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করে। এ প্রসঙ্গে দার্শনিকাচার্য ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের উক্তিটি প্রসঙ্গত স্মরণীয় — "The process of God-making in the factory of man's mind cannot be seen so clearly any where else as in the Rgveda".

সামবেদ

ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাচীনতম বিবরণ আমরা বেদ থেকে পাই। চারটি বেদের মধ্যে দ্বিতীয় হল সামবেদ। সামবেদ হল বৈদিক ঋষিদের গীতিসংকলন। মানুষের কথাগুলি গানের মাধ্যমে কানের ভিতর দিয়ে মানুষের মর্মে প্রবেশ করে। গানের দ্বারাই অতিসহজে আমাদের অন্তরের পরিতৃপ্তি সাধিত হয়। তাই সমাজে সংগীতের স্থান অতি উচ্চে। এই জন্যই সম্ভবতঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন — "বেদানাং সামবেদোঽস্মি"। অর্থাৎ বেদের মধ্যে আমি সামবেদ।

'সাম' শব্দের অর্থ গান। জৈমিনী বলেছেন — "গীতিষু সামাখ্যা", অর্থাৎ যে মন্ত্রগুলি সুরসংযোগে গান করা হত সেগুলির নাম সাম। এই লক্ষণানুসারে যদিও সাম বলতে প্রগীত মন্ত্রবাক্যই বোঝায়, তবু পন্ডিতগণের অনুমান যে, প্রাচীনতম ব্যবহারে সাম কথাটির অর্থ ছিল সুর বা melody. প্রসিদ্ধ বেদভাষ্যকার আচার্য সায়ন ঋক্‌মন্ত্রকে 'সাম্যের কারণ ও আশ্রয়' বলেছেন — "গীয়মানস্য সাম্নঃ আশ্রয়ভূতা ঋচঃ সামবেদে সমান্নায়ন্তে।"

সামবেদের মন্ত্র : সামবেদের অধিকাংশ মন্ত্রই ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। সামবেদের ১৫৪৯টি মন্ত্রের মধ্যে ৭৫টি মন্ত্র ছাড়া সব মন্ত্রই ঋগ্বেদ থেকে গৃহীত হয়েছে। এই সব মন্ত্রের অধিকাংশ ঋক্‌সংহিতার অষ্টম ও নবম মন্ডলের অন্তর্ভুক্ত। ঋগ্বেদের মন্ত্র সামবেদে পুনরুক্ত হলেও প্রধান পার্থক্য হল, ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি গানরহিত এবং সামবেদের মন্ত্রগুলি সামগানযুক্ত। অনেকের মতে সামবেদের মন্ত্রগুলি সোমযোগে 'উদ্‌গাতা' ঋত্বিক ও তাঁর সহকারীগণ গান করে থাকেন। এদিক থেকে বিচার করলে সামবেদকে ঋগ্বেদের দ্বিতীয় সংস্করণ মাত্র বলা যায়।

সামবেদের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু ঃ— শাখা — ব্যাকরণ ও পুরাণাদিতে বলা হয়েছে যে, এককালে সামবেদের সহস্র শাখা ছিল। কিন্তু বর্তমানে এই বেদের মাত্র তিনটি শাখা

পাওয়া যায় —কৌথুম, রাণায়ণীয় এবং জৈমিণীয় বা তবলকার শাখা।

কৌথুম :— বর্তমানে কৌথুম শাখাই অধিক প্রচলিত। এই শাখায় মোট ২৮১০ ঋক্‌মন্ত্র সংকলিত হয়েছে। এগুলিতে অবশ্য একই ঋকমন্ত্র একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে। এই পুণরুক্তি বাদ দিলে মোট ঋক্‌সংখ্যা ১৪৪৯ টি। এগুলির মধ্যে ৭৫টি বাদ দিলে বাকী সমস্ত ঋক্‌মন্ত্র অধুনাপ্রাপ্ত ঋগ্বেদের শাকল্য শাখা এবং অষ্টম ও নবম মণ্ডল থেকে গৃহীত। এই শাখার সমস্ত মন্ত্রই গায়ত্রী ছন্দে লেখা। এই শাখা বঙ্গদেশ, কাশী, কান্যকুব্জ ও গুর্জর প্রদেশে প্রচলিত ছিল।

রাণায়ণীয় :—এই শাখার মন্ত্রগুলির সঙ্গে কৌথুম শাখার মন্ত্রের যথেষ্ট মিল আছে। তবে এদের উচ্চারণ একটু আলাদা। এই শাখা মহারাষ্ট্রে প্রচলিত।

জৈমিনীয় বা তবলকার শাখা :—এই শাখায় মোট ১৬৮৭টি মন্ত্র আছে। এই শাখাতে ব্রাহ্মণ (তবলকার), উপনিষদ্ (কেনোপনিষদ) শ্রৌত ও গৃহ্যসূত্র পাওয়া যায়। জৈমিনীয় শাখার প্রভাব কর্ণাটক প্রদেশে দেখা যায়।

সামবেদের বিভাগ :—কৌথুম শাখা মতে সামবেদ সংহিতা দুটি খণ্ডে বিভক্ত — আর্চিক ও উত্তরার্চিক।

আর্চিক বা পূর্বার্চিক :—ঋক্ ও গানের সংগ্রহের নাম আর্চিক। একে ছন্দ বা পূর্বার্চিকও বলা হয়। এক একটি আর্চিক ছয়টি প্রপাঠকে বিভক্ত এবং প্রতি প্রপাঠক 'দশতি' নামক খণ্ডে বিভক্ত। প্রতিটি প্রপাঠক দশভাগে বিভক্ত এবং প্রত্যেক দশতিতে দশটি করে মন্ত্র আছে। এজন্যই 'দশতি' নাম হয়েছে। কেবল ষষ্ঠ দশতিতে নয়টি মন্ত্র আছে। দশতি আবার তিন ভাগে বিভক্ত — ছন্দ, আরণ্যক ও উত্তরা। সামবেদের আর্চিক নামক খণ্ডে ৫৮৫টি ঋক্ আছে। সেগুলি সামগান যুক্ত এবং বিভিন্ন সুরে যজ্ঞে গীত হয়। পাদবদ্ধ মন্ত্রটি ঋক্। কিন্তু তার পাঠভঙ্গী হল সামগান। এইজন্য ঋক্‌কে সামের যোনি বলা হয় — "ঋক সান্নাং যোনিঃ।" সম্ভবত সে যুগে প্রচলিত বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গানগুলি গেয়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু আর্চিক ভাগ থেকে সুর গুলির পরিচয় পাওয়া যায় না।

উত্তরার্চিক :—সামবেদের দ্বিতীয় খণ্ডে অর্থাৎ উত্তরার্চিকে ৪০০টি স্তোত্র সংকলিত হয়েছে এবং প্রতিটি স্তোত্রে সাধারণত তিনটি করে ঋক্ আছে। প্রত্যেকটি ঋকে ঋগ্বেদের তিনটি করে পদ আছে। কতকগুলি ঋক্ ত্রয় সমষ্টিতে দুটি করে ও পদ দৃষ্ট হয়, কয়েকটিতে আবার তিনটিরও বেশি পদ আছে এবং অতিঅল্প কয়েকটিতে ১২টি পর্যন্ত পদের সমাবেশ দেখা যায়। বৈদিকযুগে সামগায়ক পুরোহিতদের উদ্‌গাতা বলা হত। আর্চিকভাগ আয়ত্ত করার সময় তাঁরা উত্তরার্চিক অংশে সংকলিত সুরগুলি শিখতেন যাতে সেই সকল সুরে উত্তরার্চিকের গানগুলি তাঁরা যজ্ঞে গাইতেন।

আর্চিক ও উত্তরার্চিকের মধ্যে পার্থক্য :—আর্চিক খণ্ডের মন্ত্রগুলি অংশত ছন্দ

অনুযায়ী এবং অংশত অগ্নি, ইন্দ্র, সোম দেবতানুযায়ী মন্ত্রগুলি সাজানো। কিন্তু উত্তরার্চিকে প্রধান প্রধান যাগের পারম্পর্য অনুযায়ী মন্ত্রগুলি সাজানো হয়েছে। যেমন — দশরাত্র, সাংবৎসর, একাহ, অহীন, সত্র, প্রায়শ্চিত্ত এবং ক্ষুদ্র। উভয়খণ্ডে মূল মন্ত্রগুলি লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু এই সংহিতার প্রাণস্বরূপ যে গান তা সুপ্রাচীন কাল থেকে মুখে মুখে চলে আসছে। কণ্ঠ ও যন্ত্র উভয়প্রকার সংগীত মাধ্যমে সামগান করা হত বলে অনুমান করা হয়। হস্ত ও অঙ্গুলী সঞ্চালন করে পুরোহিতগণ বিভিন্ন সুরের ইঙ্গিত দান করতেন।

সামবেদের গানগ্রন্থ :—সামবেদের সঙ্গে সংযোজিত আরও একপ্রকার সংকলন পাওয়া যায়, তার নাম গান। এগুলিতে সংখ্যা চিহ্ন ব্যবহার করে এবং অক্ষরাদির পুনরাবৃত্তি করে একপ্রকার প্রাচীন স্বরলিপির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এগুলির মাঝে মাঝে উল্লাসব্যঞ্জক কিছু শব্দও দেখা যায়। সামবেদের গানগ্রন্থগুলি সংখ্যায় চারটি — গ্রামগেয়গান, অরণ্যগেয় গান, ঊহগান ও ঊহ্যগান।

গ্রামগেয় গান : আর্চিকের প্রথম অধ্যায় থেকে পঞ্চম অধ্যায় পর্যন্ত যে সকল সামগান গ্রামে গাওয়া হত তার নাম গ্রামগেয় গান। গ্রামগেয় গানকে প্রকৃতিগান, যোনিগান এবং বেদসামও বলা হয়। গ্রামগেয়গানের প্রপাঠক সংখ্যা ১৭টি।

অরণ্যগেয়গান :—যে সব গান গ্রামে নিষিদ্ধ, অরণ্যে নিভৃতে গুরুর নিকট শিক্ষা করতে হত সেগুলির নাম অরণ্যগেয় গান। আর্চিকের ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই গান দৃষ্ট হয়। অরণ্যগেয়গানের প্রপাঠকের সংখ্যা ছয়টি।

ঊহগান :— যজ্ঞে-সামগানের যে ক্রম অনুসরণ করতে হয় সেই ক্রমের (order) নির্দেশ 'ঊহ' ও ঊহ্য নামক গ্রন্থে আছে। তারমধ্যে ঊহে গ্রামগেয় গানের ক্রম নির্দেশ আছে। এর প্রপাঠক সংখ্যা হল তেইশটি।

ঊহ্যগান :—ঊহ্যে অরণ্যগেয় গানের নির্দেশ আছে। ঊহ্যগানের আর একটি নাম রহস্যগান। ঊহ্যগানের প্রপাঠকের সংখ্যা ছয়টি। পূর্বার্চিকের ষষ্ঠ অধ্যায়ের পরবর্ত্তী ঋক্‌গানগুলি ঊহ ও ঊহ্যগান।

উক্ত চারটি গ্রন্থের প্রপাঠক গুলির মধ্যে প্রথম তেরটি প্রপাঠকের সমস্ত মন্ত্র অগ্নিদেবতা বিষয়ক, অন্তিম এগারটি প্রপাঠকের মন্ত্ররাজি সোমদেবতানিষ্ঠ এবং মধ্যবর্ত্তী প্রপাঠকগুলির মুখ্য দেবতা হলেন ইন্দ্র।

ভারতীয় মার্গসংগীতের উৎস সামবেদ :—'সাম' শব্দে সর্বদাই গান বোঝায়। ঋক্ মন্ত্রে সাতটি স্বর যোজনা করে সামগান করা হত। সামবেদের যুগে সপ্তস্বরের নাম ছিল — ক্রুষ্ট, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্দ্র ও অতিস্বার্য। নারদশিক্ষার রচয়িতা নারদ এবং ভাষ্যকার আচার্য সায়ন সামবেদের সপ্তস্বরকে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম নামে অভিহিত করেছেন। সামবেদের এই সপ্তস্বরই পরবর্ত্তীকালে ভারতীয়

মার্গসংগীতে ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ বা সংক্ষেপে প্রত্যেকটির প্রথম অক্ষর নিয়ে সা (যা), রি (ঋ), গা, মা, পা, ধা, নি বলা হয়। সামবেদের যুগের অন্তিম পর্বে যে সাতটি স্বরের উদ্ভব হয়েছিল সে বিষয়ে ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রকারগণ প্রায় সকলেই একমত। রামামাত্য রচিত 'স্বরমেলকলানিধি' নামক প্রসিদ্ধ সংগীত শাস্ত্র গ্রন্থের ভূমিকায় রামস্বামী আয়ার বলেছেন — "The scale of the Marga music ordinarily rangedfrom one to four notes, but during the later saman period, rose to seven notes." ভারতীয় মার্গ সংগীত বৈদিক কিনা তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। কিন্তু বর্তমান কালে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, রামস্বামী আয়ার প্রমুখ সংগীত গবেষকগণ মার্গসংগীতের বৈদিকত্ব এবং সামগানকে মার্গসংগীতের উৎস বলে দ্বিধাহীনকণ্ঠে স্বীকার করেছেন।

সুতরাং সাহিত্য হিসাবে সামবেদের বিশেষ কোন মূল্য না থাকলেও ভারতীয় মার্গসংগীত ও লোকসংগীতের ইতিহাস পর্যালোচনায়, যাগযজ্ঞে এবং ইন্দ্রজালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাসে সামবেদ বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। এ প্রসঙ্গে পণ্ডিতপ্রবর Winternitz এর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য — "Thus the Samveda-Samhita is certainly Valuable to the history of the Indian Concept of sacrifice and magic and its ganas are certainly very important for the history of music."

যজুর্বেদ

'ত্রয়ী' শব্দটি দ্বারা ঋক্, সাম ও যজুঃ — এই তিনটি বেদকে বোঝানো হয়েছে। এই তিনটি বেদের মধ্যে যজুর্বেদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচিত হল।

নামকরণ : 'যজুঃ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে যজ্ঞার্থক 'যজ্' ধাতু থেকে। ঋক্, সাম ভিন্ন অবশিষ্ট বেদমন্ত্র যজুঃ নামে অভিহিত হয়েছে। ঋষি জৈমিনি 'পূর্বমীমাংসাসূত্রে' যজুঃ মন্ত্রের লক্ষণে বলেছেন — "শেষে যজুঃ শব্দ"। 'যজুঃ' মন্ত্রের দ্বারা যজ্ঞে আহুতি প্রদানকারী অধ্বর্যুদের মন্ত্র সংকলিত হয়েছে যে সংহিতায়, তাকে বলা হয় 'যজুঃ সংহিতা বা অধ্বর্যুবেদ বা কর্মবেদ বা অধ্বর্যববেদ। যে মন্ত্রের সাহায্যে অধ্বর্যুগণ যজ্ঞদেহ নির্মাণ করেন তথা যজ্ঞের কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করেন তা-ই 'যজুঃ'। নিরুক্ত মতে "যজুর্য জতে" অর্থাৎ 'যজ্' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন 'যজুঃ' যজ্ঞানুষ্ঠানের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথাই ঘোষণা করে। বায়ুপুরাণেও বলা হয়েছে—

"যচ্ছিষ্টঞ্চ যজুর্বেদে, তেন যজ্ঞমযুঞ্জত।
যাজনাদ্ধি যজুর্বেদ ইতি শাস্ত্রস্য নির্ণয়ঃ।"

যজুঃ সংহিতায় কিছু ঋক্ মন্ত্র থাকলেও অধিকাংশ মন্ত্রই যজুর্বেদের নিজস্ব মন্ত্র। যজুর্বেদ সংহিতার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, এই বেদেই প্রথম গদ্যের ব্যবহার করা হয়েছে

এবং গদ্যাংশগুলি আপন বৈশিষ্ট্য ভাস্বর। পরিপূর্ণ দীর্ঘবাক্যে যজমান নিজের মনোভাব প্রকাশ করেছেন — যজুর্বেদে এরূপ দৃষ্টান্ত থাকলেও সাধারণভাবে ছোট ছোট অর্থহীন অথবা অল্পার্থযুক্ত সূত্রাকারে রচিত বাক্যেই অধিকাংশ যজুঃমন্ত্র রচিত। এই ধরনের রচনাগুলি সম্বন্ধে Winternitz বলেন— ".....one of the chief causes of the fact that these prayers and sacrifice -formulae often appear to us to be nothing but senseless conglomerations words, is the identification and combination on of things which have nothing at all to do with other, so very propular in the Yajurveda." ঋক্ ও সাম বেদে গদ্য মন্ত্র দেখা যায় না, যজুর্বেদই প্রথম গদ্যমন্ত্রের আবির্ভাব।

রচনাকাল : যজুর্বেদ সংহিতার রচনাকাল সম্পর্কে নিশ্চিৎভাবে কিছু বলা যায় না। তবে এই বেদে তৎকালীন ভৌগোলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক যে চিত্র পাওয়া যায় তার থেকে অনুমান করা যায় যে, যজুর্বেদের রচনাকাল ঋক্‌বেদের তুলনায় কিছুটা পরবর্ত্তী কালের। কুরু ও পাঞ্চালগণের নাম যজুর্বেদে দৃষ্ট হয়, কুরুক্ষেত্র পবিত্র তীর্থক্ষেত্র রূপে যজুর্বেদে বর্ণিত হয়েছে। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, যজুর্বেদ ঋক্‌সংহিতার পরবর্ত্তী কালের রচনা।

যজুঃর্বেদের বিভাগ : এককালে অধ্বর্যুগণের অনেক সম্প্রদায় ছিল এবং সম্প্রদায় ভেদে যজুর্বেদের বহু শাখা ছিল বলে জানা যায়। অবশ্য অধুনালভ্য যজুর্বেদ গ্রন্থাবলী মূলতঃ দুভাগে বিভক্ত — শুক্ল যজুর্বেদ ও কৃষ্ণ যজুর্বেদ।

শুক্লযজুর্বেদ : শুক্লযুজর্বেদের প্রাচীন আচার্য বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্যের নামানুসারে এই বেদ বাজসনেয় সংহিতা নামে ও পরিচিত। কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন নামে দুটি সম্প্রদায় ভেদে শুক্লযজুর্বেদের দুটি শাখা পাওয়া যায়। শুক্লযজুর্বেদ বা বাজসনেয় সংহিতায় চল্লিশটি অধ্যায়, ৩০৩টি অনুবাক্ এবং ১৯১৫টি কাণ্ডিকা বিদ্যমান। এই সংহিতার চল্লিশটি অধ্যায়ের মুখ্য বিষয়বস্তু হল — **প্রথম অধ্যায়ে** দশপূর্ণমাস যজ্ঞের এবং পিণ্ডপিতৃযজ্ঞের বিষয় উক্ত হয়েছে। **তৃতীয় অধ্যায়ে** অগ্নিহোত্র যজ্ঞ ও চাতুর্মাস্যাদি যাগের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। **চতুর্থ থেকে অষ্টম** অধ্যায় পর্যন্ত জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের বিধান সন্নিবিষ্ট হয়েছে। **নবম অধ্যায়ে** রাজসূয়যজ্ঞ, **দশম অধ্যায়ে** সৌত্রামনী যাগ এবং **একাদশ থেকে অষ্টাদশ অধ্যায়** পর্যন্ত অগ্নিচয়নের বিধি-বিধান বিশেষরূপে উক্ত হয়েছে। **ঊনবিংশ থেকে পঞ্চবিংশ অধ্যায়** পর্যন্ত অশ্বমেধাদি যজ্ঞের বিধান, **ষড়বিংশ থেকে উনচল্লিশ অধ্যায়** পর্যন্ত চৌদ্দটি অধ্যায়ে পূর্বোক্ত যজ্ঞাদির যজ্ঞের বিস্তৃত বিবরণও দৃষ্ট হয়। এই সংহিতাল শেষ **চল্লিশতম অধ্যায়টি** হল ঈশোপনিষদ। মন্ত্রের অঙ্গীভূত বলে এই উপনিষদটিই একমাত্র 'মন্ত্রোপনিষদ' নামে পরিচিত। শুক্ল যজুর্বেদের অন্যান্য অংশগুলি হল — ব্রাহ্মণ-শতপথ ব্রাহ্মণ, আরণ্যক-বৃহদারণ্যক, উপনিষদ-বৃহদারণ্যক, ঈশোপনিষদ,কল্পসূত্র-শ্রৌত-কাত্যায়ন,

গৃহ্যসূত্র-পারস্কর, ধর্ম-শঙ্খলিখিত, শুল্বকাত্যায়ন। শুক্ল যজুর্বেদের কাণ্ব শাখার উপর আচার্য সায়ন ভাষ্য রচনা করেছেন। এছাড়া বৈদিকাচার্য উবট ও মহীধর নামে দুজন বিশ্রুতপণ্ডিত শুক্ল যজুর্বেদের পৃথক পৃথক দুটি ভাষ্য প্রণয়ন করেছিলেন।

কৃষ্ণ যজুর্বেদ : বৈশম্পায়নের প্রিয় শিষ্য মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য গুরুর সঙ্গে বিবাদ করে লব্ধ জ্ঞান বমন করে দিলে তাঁর সহাধ্যায়ী ঋষিগণ তিত্তিরি পাখির আকারে তা গ্রহণ করেন বলেই এই বিদ্যার নাম হয় তৈত্তিরীয় সংহিতা। আবার মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের সংমিশ্রণ থাকায় এই বেদের নাম হয়েছে কৃষ্ণযজুর্বেদ। কৃষ্ণযজুর্বেদের চারটি শাখা পাওয়া যায় — কাঠক সংহিতা, কপিষ্টল সংহিতা, মৈত্রায়নী সংহিতা এবং তৈত্তিরীয় সংহিতা। কৃষ্ণ যজুর্বেদ শুক্লযজুর্বেদ অপেক্ষা প্রাচীন। কৃষ্ণ যজুর্বেদ সংহিতা মোট সাতটি কাণ্ডে ৪৪টি প্রপাঠক, ৬৪৪টি অনুবাক্, ২০,১৮৪টি মন্ত্র আছে। মন্ত্রগুলির মধ্যে অধ্বর্যু, যজমান ও হোতার পঠনীয় মন্ত্র আছে। উদ্দিষ্ট দেবতাগণের নামানুসারে "কাণ্ডানুক্রমণিকা" নামক প্রাচীন গ্রন্থে কাণ্ডগুলির বিভাগ দেখানো হয়েছে। এই সংহিতার প্রথম থেকেই দশপূর্ণমাস নামক ইষ্টির বিষয় বিবৃত আছে। অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে যে ইষ্টি (এক প্রকার যাগ) করতে হয় তার নাম দশপূর্ণমাস। আচার্য সায়ন কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতার ভাষ্য রচনা করেছিলেন। এছাড়া ভট্ট কৌশিক ভাস্কর মিশ্র প্রণীত জ্ঞানযজ্ঞ নামক এই সংহিতার আরও একখানি ভাষ্য পাওয়া যায়। কৃষ্ণযজুর্বেদের পঠন, পাঠন, প্রচলন দাক্ষিণাত্যে দৃষ্ট হয়, দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ ব্রাহ্মণই কৃষ্ণযজুর্বেদী।

যজুর্বেদের উপযোগিতা : ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে যজুর্বেদ একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। আদিম সমাজব্যবস্থা থেকেই ধর্ম মানুষের মনে এক অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করে আসছে। এই ধর্মবিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু মাত্র জ্ঞানলাভ করতে হলে যজুর্বেদ অপরিহার্য। এ বিষয়ে অধ্যাপক Winternitz বলেন — "These samhitas are also indispensable for understanding the whole religious and philosopic literature of the Indian in later lines". পরবর্ত্তীকালের ধর্ম ও দর্শনসাহিত্য বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে হলে যজুর্বেদের পঠন-পাঠন আবশ্যক। তাছাড়া তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তথ্যের আকর গ্রন্থ হল এই যজুর্বেদ। তদানীন্তন সমাজ জীবনের বিচিত্র বৃত্তির পরিচয় আমরা এই বেদ থেকে পাই। চিরন্তন মানবীয়ভাবে সমুজ্জ্বল কিছু প্রার্থনা মন্ত্র ও যজুর্বেদে দৃষ্ট হয়। যজুর্বেদের যুগের সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রখ্যাত গবেষিকা ড. সুকুমারী ভট্টাচার্যের একটি যুক্তিসঙ্গত বৈজ্ঞানিক ও নিরপেক্ষ বিশ্লেষণটি এখানে স্মরণ করা যেতে পারে — "যজুর্বেদের সময়ই জাতিভেদ প্রথা স্পষ্টভাবে নিরূপিত হয় ও চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বুদ্ধি ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য ব্রাহ্মণরা সামাজিকভাবে মর্যাদা ও অধিকার অর্জন করে। কৃষি ব্যবস্থার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে পুরুষ

সমাজের নিয়ন্ত্রণে এসে গিয়েছিল এবং এই সময় থেকেই যেহেতু নারী অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পুরুষের উপর একান্ত নির্ভরশীল হতে শুরু করল। তাছাড়া আর্য পুরুষেরা প্রায়ই অনার্য গোষ্ঠীভুক্ত যেসব নারীদের বিবাহ করত, সমাজে তাদের পরিপূর্ণ স্বীকৃতি না থাকার ফলে নারীর সামাজিক অবমূল্যায়ন এখান থেকেই শুরু হয়েছিল। কৃষি ব্যবস্থায় লব্ধ উদ্বৃত্ত ধন, গো সম্পদ, কুটিরশিল্প, বাণিজ্য এবং সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার সামাজিক মর্যাদার মাপকাঠি হয়ে দাঁড়ায়। বৈদিক যুগের প্রথম পর্য্যায়ে যেমন যজ্ঞই ধর্মাচরণের ও প্রকৃতির উপর জয়লাভ করার একমাত্র উপায় ছিল এখন আর ঠিক তেমন নয়, তপস্যা এখন একটি প্রবল সৃষ্টিশীল শক্তি, মহাবিশ্বে সৃষ্টির অন্তরালে নিহিত এ শক্তি"।

উপসংহারে ডঃ যোগীরাজ বসু তাঁর "বেদের পরিচয়" নামক গ্রন্থে যে মন্তব্যটি করেছেন তা এখানে স্মরণীয় — "বৈদিক যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস ও শুক্লযজুর্বেদ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ইহার গুরুত্ব প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সকল দেশের বিদ্বৎমণ্ডলী স্বীকার করিয়াছেন। তদানীন্তন চতুর্বর্ণ, প্রতিলোম ও অনুলোমবর্ণ, জাতিভেদ, অন্ত্যজ ও অনার্য জাতির নাম, জীবিকানির্বাহার্থ বিবিধ বৃত্তি ও কুটিরশিল্প, আদিবাসীগণের ধর্ম, শৈবধর্মের মূল, রুদ্র-শিব-তত্ত্ব প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় সন্দেশ ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই সংহিতায় পাওয়া যায়।"

কৃষ্ণযজুর্বেদ ও শুক্লযজুর্বেদের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

'ত্রয়ী' শব্দটি দ্বারা ঋক্, সাম ও যজুঃ — এই তিনটি বেদকে বোঝানো হয়েছে। এই তিনটি বেদের মধ্যে যজুর্বেদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচিত হল।

'যজুঃ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে যজ্ঞার্থক 'যজ্' ধাতু থেকে। ঋক্, সাম ভিন্ন অবশিষ্ট বেদমন্ত্র যজুঃ নামে অভিহিত হয়েছে। ঋষি জৈমিনি 'পূর্বমীমাংসাসূত্রে' যজুঃ মন্ত্রের লক্ষণে বলেছেন — "শেষে যজুঃ শব্দ"। 'যজুঃ' মন্ত্রের দ্বারা যজ্ঞে আহুতি প্রদানকারী অধ্বর্যুদের মন্ত্র সংকলিত হয়েছে যে সংহিতায়, তাকে বলা হয় 'যজুঃ' সংহিতা বা অধ্বর্যুবেদ বা কর্মবেদ বা অধ্বর্যবেদ। যে মন্ত্রের সাহায্যে অধ্বয়ুগণ যজ্ঞদেহ নির্মাণ করেন তথা যজ্ঞের কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করেন তা-ই 'যজুঃ'। নিরুক্ত মতে "যজুর্য জতে" অর্থাৎ 'যজ্' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন 'যজুঃ' যজ্ঞানুষ্ঠানের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথাই ঘোষণা করে। বায়ুপুরাণেও বলা হয়েছে—

"যচ্ছিষ্টঞ্চ যজুর্বেদে, তেন যজ্ঞমযুঞ্জত।
যাজনাদ্ধি যজুর্বেদ ইতি শাস্ত্রস্য নির্ণয়বঃ।"

যজুঃ সংহিতায় কিছু ঋক্ মন্ত্র না থাকলেও অধিকাংশ মন্ত্রই যজুর্বেদের নিজস্বমাত্র। যজুর্বেদ সংহিতার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, এই বেদেই প্রথম গদ্যের ব্যবহার করা হয়েছে

এবং গদ্যাংশগুলি আপন বৈশিষ্ট্য ভাস্বর। পরিপূর্ণ দীর্ঘবাক্যে যজমান নিজের মনোভাব প্রকাশ করেছেন — যজুর্বেদে এরূপ দৃষ্টান্ত থাকলেও সাধারণভাবে ছোট ছোট অর্থহীন অথবা অল্পার্থযুক্ত সূত্রাকারে রচিত বাক্যেই অধিকাংশ যজুঃমন্ত্র। এই ধরনের রচনাগুলি সম্বন্ধে Winternitz বলেন— ".....One of the chief causes of the fact that these prayers and sacrifice -formulae often appear to us to be nothing but senseless conglomerations words, is the identification an combination on the things which have nothing at all to do with other, so very propular in the Yajurveda." ঋক্ ও সাম বেদে গদ্য মন্ত্র দেখা যায় না, যজুর্বেদেই প্রথম গদ্যমন্ত্রের আবির্ভাব।

রচনাকাল : যজুর্বেদ সংহিতার রচনাকাল সম্পর্কে নিশ্চিৎভাবে কিছু বলা যায় না। তবে এই বেদে তৎকালীন ভৌগোলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক যে চিত্র পাওয়া যায় তার থেকে অনুমান করা যায় যে, যজুর্বেদের রচনাকাল ঋক্‌বেদের তুলনায় কিছুটা পরবর্ত্তী কালের। কুরু ও পাঞ্চালগণের নাম যজুর্বেদ দৃষ্ট হয়, কুরুক্ষেত্র পবিত্র তীর্থক্ষেত্র রূপে যজুর্বেদে বর্ণিত হয়েছে। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, যজুর্বেদ ঋক্‌সংহিতার পরবর্তী কালের রচনা।

যজুঃর্বেদের বিভাগ : এককালে অধ্বর্যুগণের অনেক সম্প্রদায় ছিল এবং সম্প্রদায় ভেদে যজুর্বেদের বহু শাখা ছিল বলে জানা যায়। অবশ্য অধুনালভ্য যজুর্বেদ গ্রন্থাবলী মূলতঃ দুভাগে বিভক্তি — শুক্লযজুর্বেদ ও কৃষ্ণযজুর্বেদ।

শুক্লযজুর্বেদ : শুক্লযজুর্বেদের প্রাচীন আচার্য বাজসনের যাজ্ঞবল্ক্যের নামানুসারে এই বেদ বাজসনেয় সংহিতা নামেও পরিচিত। কান্ব ও মাধ্যন্দিন নামে দুটি সম্প্রদায় ভেদে শুক্লযজুর্বেদের দুটি শাখা পাওয়া যায়। শুক্লযজুর্বেদ বা বাজসনেয় সংহিতায় চল্লিশটি অধ্যায়, ৩০৩টি অনুবাক্ এবং ১৯১৫টি কাণ্ডিকা বিদ্যমান। এই সংহিতার চল্লিশটি অধ্যায়ের মুখ্য বিষয়বস্তু হল — প্রথম অধ্যায়ে দশপূর্ণনামা যজ্ঞের এবং পিণ্ডপিতৃযজ্ঞের বিষয় উক্ত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ ও চাতুর্মাস্যাদি যাগের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। চতুর্থ থেকে অষ্টম অধ্যায় পর্যন্ত জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের বিধান সন্নিবিষ্ট হয়েছে। নবম অধ্যায়ে রাজসূয়যজ্ঞ, দশম অধ্যায়ে সৌত্রামনী যাগ এবং একাদশ থেকে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত অগ্নিচয়নের বিধিবিধান বিশেষরূপে উক্ত হয়েছে। ঊনবিংশ থেকে পঞ্চবিংশ অধ্যায় পর্যন্ত অশ্বমেধাদি যজ্ঞের বিধান, ষড়বিংশ থেকে উনচল্লিশ অধ্যায় পর্যন্ত চৌদ্দটি অধ্যায়ে পূর্বোক্ত যজ্ঞাদির যজ্ঞের বিস্তৃত বিবরণও দৃষ্ট হয়। এই সংহিতার শেষ চল্লিশতম অধ্যায়টি হল ঈশোপনিষদ। মন্ত্রের অঙ্গীভূত বলে এই উপনিষদটিই একমাত্র মন্ত্রোপনিষদ নামে পরিচিত। শুক্ল যজুর্বেদের অন্যান্য অংশগুলি হল — ব্রাহ্মণ-শতপথ ব্রাহ্মণ, আরণ্যক-বৃহদারণ্যক, উপনিষদ-বৃহদারণ্যক ও ঈশোপনিষদ, কল্পসূত্র-শ্রৌতি-কাত্যায়ন,

গৃহ্যসূত্র-পারস্কর, ধর্ম-শঙ্খলিখিত, শুল্ব-কাত্যায়ন। শুক্লযজুর্বেদের কান্ব শাখার উপর আচার্য সায়ন ভাষ্য রচনা করেছেন। এছাড়া বৈদিকাচার্য উবট ও মহীধর নামে দুজন বিশ্রুতপন্ডিত শুক্ল যজুর্বেদের পৃথক পৃথক দুটি ভাষ্য প্রণয়ন করেছিলেন।

কৃষ্ণযজুর্বেদ : বৈশম্পায়নের প্রিয় শিষ্য মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য গুরুর সঙ্গে বিবাদ করে তাঁর জ্ঞান বমন করে দিলে তাঁর সহাধ্যায়ী ঋষিগণ তিত্তিরি পাখির আকারে তা গ্রহণ করেন বলেই এই বিদ্যার নাম হয় তৈত্তিরীয় সংহিতা। আবার মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের সংমিশ্রণ থাকায় এই বেদের নাম হয়েছে কৃষ্ণযজুর্বেদ। কৃষ্ণযজুর্বেদের চারটি শাখা পাওয়া যায় — কাঠকসংহিতা, কপিষ্টলসংহিতা, মৈত্রায়নীসংহিতা এবং তৈত্তিরীয়সংহিতা। কৃষ্ণযজুর্বেদ শুক্লযজুর্বেদ অপেক্ষা প্রাচীন। কৃষ্ণ যজুর্বেদ সংহিতা মোট সাতটি কাব্যে ৪৪টি প্রপাঠক, ৬৪৪টি অনুবাক্, ২০, ১৮৪টি মন্ত্র আছে। মন্ত্রগুলির মধ্যে অধ্বর্যু, যজমান ও হোতার পঠনীয় মন্ত্র আছে। উদ্দিষ্ট দেবতাগণের নামানুসারে "কোন্ডানুক্রমণিকা" নামক প্রাচীন গ্রন্থে কান্ডগুলির বিভাগ দেখানো হয়েছে। এই সংহিতার প্রথম থেকেই দশপূর্ণমাস নামক ইষ্টির বিষয় বিকৃত আছে। অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে যে ইষ্টি (এক প্রকার যাগ) করতে হয় তার নাম দশপূর্ণিনামা। আচার্য সায়ন কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতার ভাষ্য রচনা করেছিলেন। এছাড়া ভট্ট কৌশিক ভাস্কর মিশ্র প্রণীত জ্ঞানযজ্ঞ নামক এই সংহিতার আরও একখানি ভাষ্য পাওয়া যায়। কৃষ্ণযজুর্বেদের পঠন, পাঠন, প্রচলন দাক্ষিণাত্যে দৃষ্ট হয়, দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ ব্রাহ্মণই কৃষ্ণযজুর্বেদী।

সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য : (i) কৃষ্ণযজুর্বেদের নাম তৈত্তিরীয় সংহিতা এবং শুক্ল যজুর্বেদের নাম বাজসনেয় সংহিতা। (ii) কৃষ্ণযজুর্বেদ শুক্লযজুর্বেদ অপেক্ষা প্রাচীন। (iii) কৃষ্ণযজুর্বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ অংশ মিশ্রিত অবস্থায় আছে। (iv) শুক্লযজুর্বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ অংশ পৃথক ভাবে আছে (v) কৃষ্ণযজুর্বেদের ছয়টি শাখা। (vi) শুক্ল যজুর্বেদের শাখা ৫০টি। (vii) কৃষ্ণযজুর্বেদের মৈত্রায়নী শাখার কান্ডসংখ্যা—৪টি, কান্ডগুলি মোট ৫৪টি প্রপাঠকে বিভক্ত। তৈত্তিরীয় শাখার সাতটি অধ্যায়, ৪৪টি প্রপাঠক। (viii) শুক্লযজুর্বেদের ৪০টি অধ্যায়, ১০৮টি যজুঃ ও ৯৭৫টি ঋক্। প্রথম ১৮টি অধ্যায় প্রাচীন। এগুলি তৈত্তিরীয় সংহিতাতেও আছে। বাকীগুলি পরবর্ত্তীকালের সংযোজন বলে অনুমান করা হয়।

উপসংহারে ড. যোগীররাজ বসু তাঁর "বেদের পরিচয়" নামক গ্রন্থে যে মন্তব্যটি করেছেন তা এখানে স্মরণীয় — "বৈদিক যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস ও শুক্ল যজুর্বেদ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ইহার গুরুত্ব প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সকল দেশের বিদ্বৎ মণ্ডলী স্বীকার করিয়াছেন। তদানীন্তন চতুর্বর্ণ, প্রতিলোম ও অনুলোমবর্ণ, জাতিভেদ, অন্ত্যজ ও অনার্য জাতির নাম, জীবিকা নির্বাহার্য বিবিধ বৃত্তি ও কুটিরশিল্প, আদিবাসীগণের ধর্ম, শৈব ধর্মের মূল, রুদ্র-শিব-তত্ত্ব প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় সন্দেশ ও

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই সংহিতায় পাওয়া যায়।"

অথর্ববেদের কাল

অথর্ববেদের প্রাচীন নাম 'অথর্বাঙ্গিরসবেদ'। প্রাচীনকালে 'অথর্বন্' শব্দের দ্বারা এক শ্রেণির অগ্নি উপাসককে বোঝাত। 'অঙ্গিরাগণ' ও ছিলেন অগ্নি যাজক সম্প্রদায়। কালক্রমে 'অথর্বন্' ও 'অঙ্গিরস' এই দুটি শব্দ ঐন্দ্রজালিক মন্ত্র ও বিধি অর্থে ব্যবহৃত হত। অথর্ববেদ মূলতঃ ঐন্দ্রজালিক ও প্রহেলিকা জাতীয় রহস্যময় মন্ত্রের সমষ্টি বলে এক 'অথর্ববেদ' নামে অভিহিত করা হয় — "The old name Atharvangirasah thus means two kinds of magic for mulae which form the chief contents of Atharvaveda." 'অথর্বন্' বলতে ভেষজবিদ্যা ও শান্তি, পৌষ্টিক প্রভৃতি মাঙ্গালিক ক্রিয়াকাণ্ডকে আর শত্রুর অনিষ্ট কামনায় প্রযুক্ত মন্ত্রসমূহকে বলা হয় 'আঙ্গিরস'। এই দুয়ের মিলনই হল 'অথর্বাঙ্গিরসবেদ'। প্রাচীন পরম্পরা অনুসারে বেদকে 'ত্রয়ী' আখ্যা দেওয়া হত। ঋক, যজুঃ ও সাম — এই তিনটি ত্রয়ীর অন্তর্গত। কেউ কেউ বলেন, অথর্ববেদে অশুভ ঐন্দ্রজালিক কর্মকাণ্ডের আলোচনার জন্যই অথর্ববেদকে 'ত্রয়ীর' মর্যাদা বা 'ত্রয়ীর' অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। যদিও পরবর্ত্তীকালে অথর্ববেদকে 'ত্রয়ীর' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অথর্ববেদের সংকলন কাল সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে, ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে বেদ অপৌরুষেয়। কিন্তু আধুনিককালের দৃষ্টিভঙ্গিতে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও নিত্যত্ব সবজনস্বীকৃত নয়। তাই তার কাল বিচারের আবশ্যকতা আছে। কিন্তু বিভিন্নকালে বৈদিক সাহিত্য রচিত ও সংকলিত হয়েছিল। তাছাড়া ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ প্রভৃতি বিশাল বৈদিক সাহিত্যের কাল নির্ণয় করা অত্যন্ত দুষ্কর। তথাপি কতকগুলি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে অথর্ববেদের কাল নির্ণয়ে প্রয়াসী হওয়া যেতে পারে।

ব্যাকরণ শব্দ ভাণ্ডারের ভিত্তিতে তথা মূলতঃ ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে অথর্ববেদ সামগ্রিকভাবে ঋগ্বেদের তুলনায় পরবর্ত্তী সময়স্তরের প্রমাণ বহন করে। অথর্ববেদে এমন কিছু শব্দ দেখা যায় যেগুলি অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও মধ্যপ্রাচ্যীয় অ্যাসিরীয়, সুমেরীয় ভাষাগোষ্ঠী থেকে এসেছে। যেমন—উরুগুল, তৈমত ইত্যাদি। উক্ত দেশগুলির সঙ্গে নৌপথে বাণিজ্যের মাধ্যমে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে ভারতবর্ষের যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল, এই শব্দগুলি সেই সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অতএব অথর্ববেদের কিছু অংশের রচনাকাল এই সময়ের পূর্ববর্ত্তী বা সমসাময়িক।

অথর্ববেদের রচনারীতি, ছন্দের বৈচিত্র্য ও অলংকারের দিক দিয়ে বিচার করলে অথর্ববেদকে ঋগ্বেদ থেকে পরবর্ত্তীকালের রচনা বলে মনে হয়। ঋগ্বেদের ভাষা অপেক্ষা

অথর্ববেদের ভাষায় অধিকসংখ্যায় পরবর্ত্তীকালের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ঋগ্বেদ সম্পূর্ণ পদ্যে লেখা, অথর্ববেদ গদ্য ও পদ্যের সংমিশ্রণে রচিত। তাছাড়া ঋগ্বেদের ছন্দ ও অলংকার কাঠামো যেমন সুনিয়ন্ত্রিত, অথর্ববেদে কিন্তু তা দেখা যায় না। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, অথর্ববেদ ঋগ্বেদের অন্ততঃ দেড়শত থেকে দুশত বৎসরের পরবর্ত্তীকালের রচনা।

অথর্ববেদে তৎকালীন ভারতবর্ষের যে ভৌগোলিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চিত্র পরিলক্ষিত হয়, তার থেকে প্রমাণিত হয় যে, অথর্ববেদ ঋগ্বেদের পরবর্ত্তীকালের রচনা। অথর্ববেদের যুগে দেখা যায় যে, আর্যগণ সিন্ধুনদের তীর থেকে ক্রমশ দক্ষিণ পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে গাঙ্গেয় উপত্যকায় বসতি স্থাপন করেছেন। এর প্রদান নিদর্শন হল — এই অঞ্চলের ভয়ঙ্কর ও শক্তিশালী প্রাণী বাঘের (Royal Bengal Tiger) কয়েকবার উল্লেখ আমরা সর্বপ্রথম অথর্ববেদে পাই। এছাড়া অথর্ববেদে রাজার রাজ্যাভিষেকের সময় রাজকীয় প্রতীকরূপে ব্যাঘ্রচর্মে উপবেশনের বিধান লক্ষিত হয়। অথর্ববেদে আমরা আরও লক্ষ্য করি যে, জাতিভেদ প্রথা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটি জাতির সুনির্দিষ্ট বিভাজন হয়েছে এবং ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতিপাদিত হয়েছে। এর থেকে সহজেই অনুমেয় যে অথর্ববেদ নবীনতর।

ঋগ্বেদে দেবতাদের যে ভূমিকা ছিল, অথর্ববেদ তাঁদের প্রকৃতিগত অনেক পরিবর্ত্তন দেখা যায়। বহুক্ষেত্রেই তাঁদের প্রকৃতিযোনিত্ব (natural origin) লুপ্ত হয়েছে এবং তাঁরা স্বতন্ত্র দেবত্বাতে রূপান্তরিত হয়েছেন। ঋগ্বেদে দেবতাদের উদ্দেশ্যে যে স্তুতি পাওয়া যায় তাতে তাঁদের বহুমুখী চরিত্র ও কার্যকলাপ পরিস্ফুট হয়েছে। কিন্তু অথর্ববেদের দেবতাদের ক্ষেত্রে শত্রুবিনাশী রূপটিই বেশী প্রকট হয়েছে।

ঋগ্বেদের মত অথর্ববেদে সৃষ্টিতত্ত্ব ও কিছু দার্শনিক সূক্ত আছে, সেগুলি ঋগ্বেদ অপেক্ষা পরবর্ত্তী যুগের উচ্চ চিন্তাপ্রবণতাকে নির্দেশ করে। তথাপি অথর্ববেদের দার্শনিক সূক্তগুলিকেও অশুভ আভিচারিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন — 'অসৎ' নামক দার্শনিক ধারণার কথা উল্লেখ করা যায়। শত্রু, অসুর এবং ঐন্দ্রজালিকদের বিনাশ করার জন্য এই অসৎকে ব্যবহার করা হয়েছে। বিশুদ্ধ দার্শনিক চিন্তাধারার বিচিত্র প্রয়োগ একথাই প্রমাণ করে যে, অথর্ববেদ ঋগ্বেদের অনেক পরবর্ত্তীকালের রচনা।

অথর্ববেদের প্রাপ্ত শাখা দুটির মধ্যে কালের ব্যবধানও যথেষ্ট। এই সংহিতার শৌনক শাখা অথর্ববেদ রূপে প্রচলিত। এই শাখা ১৮৫৬ খ্রীঃ Roth (রথ) ও Whitney (হুইটনী) প্রথম প্রকাশ করেন। অপরদিকে এই বেদের পৈপ্পলাদ্ শাখাটি দীর্ঘকাল ধরে অসম্পূর্ণভাবে কাশ্মীরে প্রচলিত ছিল। Dr. Buller পৈপ্পলাদ্ শাখার পাণ্ডুলিপি কাশ্মীর থেকে আবিষ্কার করেন এবং প্রাজ্ঞ পণ্ডিত Bloomfield ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে এবং Garbe (গারবে) এই

শাখাটিকে "The Kashmirian Atharvaveda" নামে প্রকাশ করেছেন। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য অকস্মাৎ উড়িষ্যার একটি গ্রাম থেকে এই শাখার ব্রাহ্মণগ্রন্থ আবিষ্কার করেন এবং এই শাখার সম্পূর্ণতা দান করেন। মনে হয় অথর্ববেদের পৈপ্পলাদ্ শাখার প্রাচীনত্ব ও অসমাদরতার জন্যই জনমানস ও সাহিত্য থেকে ক্রমশ তা বিলুপ্ত হতে থাকে।

অথর্ববেদের পঞ্চদশকাণ্ডে আছে ব্রাত্য স্তুতি। এই ব্রাত্যরা হলেন অনার্য। বিশেষ শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের দ্বারা এই ব্রাত্যদের ব্রাহ্মণশ্রেণিভুক্ত করার বিষয়টি বিধৃত হয়েছে। এই ব্রাত্যরা সম্ভবত ভগবান বুদ্ধদেবের সমসাময়িক নাস্তিকবাদী গোষ্ঠীর পূর্বসূরী। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, অথর্ববেদের ব্রাত্যস্তুতি অংশটি বুদ্ধদেবের পূর্ববর্ত্তীকালে রচিত।

অথর্ববেদ ২০টি কাণ্ডে বিভক্ত। এতে ৩৭০টি সূক্ত ও প্রায় ৬০০০টি মন্ত্র পাওয়া যায়। তার মধ্যে ১২০০টি মন্ত্র মূলত ঋগ্বেদের প্রথম, অষ্টম ও দশম মণ্ডল থেকে গৃহীত হয়েছে। অন্যান্য মণ্ডল থেকে কিছু কিছু অংশ নেওয়া হয়েছে। বিংশকাণ্ডের ১২টি সূক্ত ছাড়া সবগুলিই ঋগ্বেদ থেকে অবিকৃত অবস্থায় নেওয়া হয়েছে। এর থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, অথর্ববেদ ঋগ্বেদের পরবর্ত্তী কালের রচনা।

ঋগ্বেদে ও যজুর্বেদে সাধারণভাবে ব্যাধি ও চিকিৎসার উল্লেখ আছে। কিন্তু শল্য চিকিৎসা এবং অস্থিবিদ্যার জন্য পরবর্ত্তী ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র অথর্ববেদের কাছে ঋণী।

ঋগ্বেদের সঙ্গে অথর্ববেদের মূল সুরেই বিশাল প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। অধ্যাপক Winternitz-এর ভাষায় — "After all it is quite a different spirit that breathes from the magic songs of the A. Veda than from the hymns of the Rgveda. Here we move in quite a different World." ঋগ্বেদের সুর ভিক্ষার ও অনুনয়-বিনয়ের। আর অথর্ববেদের সুর ঠিক এর বিপরীত। কাজেই আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে, ঋগ্বেদ অপেক্ষা অথর্ববেদ পরবর্ত্তীকালের রচনা।

উপরিউক্ত কারণসমূহ বিচার বিশ্লেষণ করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অথর্ববেদের রচনাকাল রূপে খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০-৪০০ বৎসরকে চিহ্নিত করেছেন।

অথর্ববেদের বিষয় বস্তু

বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাসে অথর্ববেদ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। প্রাচীন ভারতবর্ষের সাহিত্য, সংস্কৃতি, রীতিনীতি, ভাবধারা জানতে গেলে অথর্ববেদ অবশ্যই পাঠনীয়।

অথর্ববেদের নামকরণ : অথর্ববেদের আদিনাম 'অথর্বাঙ্গিরসবেদ'। প্রাচীনকালে 'অথর্বন্' শব্দের দ্বারা একশ্রেণির অগ্নি উপাসককে বোঝাত। অঙ্গিরাগণও ছিলেন প্রাচীন অগ্নিযাজক সম্প্রদায়। রোগবিনাশক, পুষ্টিবর্ধক, অনাবৃষ্টি নিবারক প্রভৃতি জনসাধারণের হিতার্থে ব্যবহৃত ইন্দ্রজালকে 'অথর্বন্' নামে অভিহিত করা হত। আর শত্রুর অনিষ্ট কামনায়

ব্যবহৃত কর্মবিধি ও মন্ত্রাদি ছিল আঙ্গিরসের অন্তর্গত। অথর্ববেদের মধ্যে উভয় শ্রেণির মন্ত্র আছে বলে এর নাম ছিল 'অথর্বাঙ্গিরসবেদ' বা অথর্ববেদ। সুতরাং এই শুভাশুভ ইন্দ্রজাল বিষয়ক মন্ত্র প্রতিপাদক বেদই অথর্ববেদ — "The old name Atharvangirasah thus means two kinds of magic formula which form the chief contents of Atharvaveda."

ত্রয়ী ও অথর্ববেদ : অথর্ববেদ প্রথমে বেদ সংজ্ঞাভুক্ত ছিল কিনা সে সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। বেদকে বলা হয় 'ত্রয়ী'। অনেকের মত, 'ত্রয়ী' হল ঋক্, সাম ও যজুঃ এই তিনটি বেদ। আবার অনেকে মনে করেন যে, বেদের মন্ত্রসমূহ তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত — ঋক্‌মন্ত্র, সামমন্ত্র এবং যজুঃমন্ত্র। অথর্ববেদের মন্ত্রও এই ত্রিবিধ লক্ষণাক্রান্ত। সুতরাং অথর্ববেদকে বেদ সংজ্ঞা ভুক্ত না করার কোন কারণ নেই। ছান্দোগ্যপনিষদে, বৃহদারণ্যক উপনিষদে এবং মুণ্ডকোপনিষদে অথর্বাঙ্গিরসবেদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এর থেকে অথর্ববেদের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরাও এই বেদের প্রাচীনত্ব স্বীকার করেছেন। Weber বলেন — "Atharvaveda Samhita contains pieces of great antiquity." Winternitz মনে করেন যে, অথর্ববেদের ইন্দ্রজালমূলক মন্ত্রগুলি ঋক্ সংহিতার মন্ত্রগুলির সমসাময়িক— "..... the magic poetry of the Atharvaveda is in itself at least as old as, if not older than the sacrificial poetry of the Rgveda." যজ্ঞকর্মে সাক্ষাৎভাবে অথর্ববেদের কোন উপযোগিতা ছিল না বলেই এটি ত্রয়ী বহির্ভূত বলে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল।

অথর্ববেদের গঠন বিন্যাস : অথর্ববেদ সংহিতা কুড়িটি কাণ্ডে বিভক্ত, এতে মোট ৭৩১টি সূক্ত এবং প্রায় ছয় হাজার মন্ত্র আছে। গদ্য এবং পদ্য উভয়বিধ মন্ত্র এখানে পরিলক্ষিত হয়। তবে পদ্যময় মন্ত্রই সংখ্যায় সমধিক। পদ্যে নিবদ্ধ মন্ত্রগুলি ঋক্‌মন্ত্রের লক্ষণাক্রান্ত, আর গদ্যে রচিত মন্ত্রসমূহ যজুঃ মন্ত্রের লক্ষণযুক্ত। ঋক্‌বেদ থেকে অনেক মন্ত্র এখানে গৃহীত হয়েছে। যেমন — বিংশকাণ্ডের ১২টি সূক্ত ছাড়া অন্যান্য সূক্ত ঋক্‌বেদ থেকে অবিকৃত অবস্থায় নেওয়া হয়েছে। অথর্ববেদের দুটি ভিন্নশাখা পাওয়া যায় — শৌণকীয় এবং পৈপ্পলাদ। শেষোক্ত শাখার সম্পূর্ণ সংহিতা সম্প্রতি ষাটের দশকে আবিষ্কৃত হয়েছে।

অথর্ববেদের রচনাকাল : ঋক্‌বেদের অনেক মন্ত্র, ভাষা, ছন্দ অথর্ববেদে গৃহীত হয়েছে। অতএব ঋগ্বেদের পরই অথর্ববেদ রচিত হয়েছে। অনেকে বলেন অথর্ববেদের রচনাকাল ১৯০০-৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ।

অথর্ববেদের বিষয়বস্তু : অথর্ববেদে দেবস্তুতি থাকলেও পারিবারিক ক্রিয়াকাণ্ড এবং ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারই সেখানে মুখ্য বিষয়। অভীষ্ট প্রাপ্তির ভিন্নতা অনুসারে এই বেদের বিষয়বস্তুকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যেতে পারে। যেমন — বিভিন্ন ব্যাধির প্রকোপ

দূর করার জন্য রচিত মন্ত্রগুলিকে **ভৈষজ্য মন্ত্র**। অথর্ববেদের ঋষিরা কষ্ট করে রোগের নেপথ্যে বিশেষ বিশেষ অসুরের অস্তিত্ব কল্পনা করে মন্ত্রশক্তির সাহায্যে তাকে দূর করতে চেয়েছেন। এই ভৈষজ্য মন্ত্র থেকে তৎকালীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের, বিশেষ করে শল্যবিদ্যা ও অস্থিবিদ্যার প্রভূত উন্নতির কথা জানা যায়। অথর্ববেদের কিছু মন্ত্র দীর্ঘজীবন ও সুস্বাস্থ্য লাভের জন্য প্রয়োগ করা হত। এই জাতীয় মন্ত্রকে বলা হয় **আয়ুষ্যমন্ত্র**। এগুলি সাধারণত জাতকর্ম, উপনয়ন প্রভৃতি পারিবারিক অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হত। অথর্ববেদের আর এক শ্রেণির সূক্তকে বলা হয় **পৌষ্টিকসূক্ত**। কৃষক, বণিক, পশুপালকদের স্ব স্ব বৃত্তিতে সমৃদ্ধি এবং দস্যু, তস্কর বিতাড়নের জন্য এই জাতীয় মন্ত্র রচিত হয়েছিল। কর্ষণ, শস্যরক্ষা, অনাবৃষ্টিরোধ গবাদিপশুর মঙ্গল প্রভৃতি কাজে এই জাতীয় মন্ত্র প্রযুক্ত হত। এছাড়া অথর্ববেদে আছে বজ্রপাত ও অগ্নিদাহ থেকে গৃহরক্ষার জন্য সূক্ত, পারিবারিক অশান্তি দূরীকরণের জন্য সূক্ত।

অথর্ববেদের একটি বড় অংশ জুড়ে আছে **আভিচার মন্ত্র** 'আভিচার' কথার অর্থ হল — শত্রু নিধনের অনুকূল ব্যাপার। কারো উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বা অপরের অনিষ্ট করে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই জাতীয় মন্ত্র ব্যবহৃত হত। আবার যাদুকরের মায়া প্রভাব ও শত্রুর আভিচার ক্রিয়া থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায়ও এখানে বিবৃত হয়েছে। এখানে অথর্ববেদের অধিকাংশ সূক্তে যাদুমন্ত্রের সুর প্রকট হয়ে উঠেছে। এমন কি দেবতাদের মাহাত্ম্য কীর্তন করতে গিয়েও অনেক সময় যাদু এবং কুহকের কথা অবিমিশ্রভাবে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এ প্রসঙ্গে অথর্ববেদের বরুণসূক্তের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এখানে আর এক শ্রেণির মন্ত্র পাওয়া যায়, যেগুলি রাজার নিরাপত্তা এবং উন্নতির জন্য ব্যবহৃত হত। অথর্ববেদের চতুর্দশকাণ্ডে স্ত্রীলোকের বিভিন্ন কামনা পূরণের জন্য ব্যবহারযোগ্য কিছু মন্ত্র দেখা যায়। যেমন — মনোমত পতিলাভ, সুখপ্রসব, সন্তানলাভ, গর্ভরক্ষা প্রভৃতির উদ্দেশ্যে এই জাতীয় মন্ত্র ব্যবহৃত হয়। বশীকরণ, বিবাহ এবং প্রেমমূলক মন্ত্রও এখানে পরিলক্ষিত হয়।

অথর্ববেদে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু মন্ত্রও আছে। যেমন দ্বাদশকাণ্ডের পৃথিবীসূক্ত। ক্রান্তদর্শী ঋষির দৃষ্টিতে পৃথিবী আমাদের মাতা, তিনি কল্যাণদায়িনী—

"ভূমে মাতর্নিধেহি মা ভদ্রয়া সুপ্রতিষ্ঠিতম্।"

ঋগ্বেদের আপ্রীসূক্ত এবং দানস্তুতির অনুরূপ কিছু সূক্ত এখানে পাওয়া যায়, যেগুলি যজ্ঞের সঙ্গে সম্পর্কিত। অথর্ববেদের একটি বিশেষ অংশ অধিকার করে আছে সৃষ্টিতত্ত্ব এবং দার্শনিক চিন্তা সমৃদ্ধ কিছুমন্ত্র। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কালসূক্ত (১৯/৫৩)। এখানে বলা হয়েছে যে, এই দ্যুলোক এবং ভূলোক কাল থেকেই সঞ্জাত। ভূত এবং ভবিষ্যৎ সমস্ত পদার্থ কালের রচনায় প্রকাশ পায়—

"কালোহমুং দিবমজনয়ৎ কাল ইমাঃ পৃথিবীরুত।
কালে হ ভুতং ভব্যং চেষিতং হ বি তিষ্ঠতে॥"

এছাড়া স্তম্ভসূক্ত (১০/৭, ১০/৮), প্রাণসূক্ত (১১/৪) ও অন্যতম।

অথর্ববেদের বিষয়বস্তুর সঙ্গে ঋক্ সংহিতার পার্থক্য : অথর্ববেদের বিষয়বস্তুর সঙ্গে ঋক্ সংহিতার পার্থক্য সহজে বোঝা যায়। উভয় বেদের জগৎ স্বতন্ত্র। ঋগ্বেদের জগৎ বিশ্বাস, শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ, জীবনের ছন্দে স্পন্দিত। ঋগ্বেদের ঋষিরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পনা করে তাঁদের কাছে অভীষ্ট বস্তুর জন্য প্রার্থনা জানিয়েছেন। জর্জরিত, দুঃস্বপ্ন-দুর্লক্ষণ কবলিত প্রতিপক্ষ ও শত্রুভয়ে ভীত মানুষের বিঘ্নকে অপসারিত করার জন্য যাদুমন্ত্র বা কুহকের উপরই বেশীনির্ভর করেছেন। তাই আভিচার এবং ঐন্দ্রজালিক কর্মেই অথর্বমন্ত্রের প্রয়োগ শ্রৌত যজ্ঞাদির সঙ্গে এদের বিশেষ যোগ নেই। এ কারণেই অধ্যাপক Winternitz বলেছেন — "After all it is quite a different spirit that breathes form the magic songs of the Atharvaveda than from the hymns of the Rgveda." অর্থাৎ অথর্ববেদের যাদুমন্ত্রের যে সুর তা ঋগ্বেদের সূক্ত সমূহের সুর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের।

অথর্ববেদের গুরুত্ব : বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাসে অথর্ববেদের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। প্রাচীন আর্যদের ঐহিক রীতিনীতি ও ভাবধারা জানার জন্য অথর্ববেদ এক মূল্যবান দলিল স্বরূপ। প্রাচীন ভারতীয় লৌকিক সংস্কৃতিকে জানার জন্য এই বেদ অপরিহার্য। অথর্ববেদের ধর্ম মানবজাতির আদিম ধর্ম। এই ধর্মের তিনটি বৈশিষ্ট্য — প্রতিকূল শক্তিকে শান্ত করা, বন্ধুগণকে আশীর্বাদ করা এবং অভিশাপ বর্ষণ করা। জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা-ভাবনা, কুসংস্কার অথর্ববেদে যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা অন্যান্য বেদে সেভাবে প্রতিফলিত হয়নি। তাছাড়া তন্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র ও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের ইতিহাসে অথর্ববেদের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় যাদুবিদ্যার উৎসও নিহিত আছে এই বেদে। অথর্ববেদে বিঘ্ননাশ ও সুখ শান্তির কামনা বর্ণিত হওয়ায় এই বেদকে গৃহ্যসূত্রের জনকও বলা যায়। ভারতীয় দর্শনের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রেও অথর্ববেদের দান অসামান্য। উপনিষদ যুগের চিন্তাধারায় যে দার্শনিকতার প্রাবল্য, তার পূর্বসূচনা হয়েছে অথর্ববেদে। অধ্যাপক Shende বলেন — "The Philosophical thoughts in the A.V. Fall midway between the sacrificial brahamana and the Brahmana of the Upanisada."

বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাসে অথর্ববেদের স্থান গুরুত্বপূর্ণ। এই বেদের মন্ত্রগুলি লোকহিতৈষণার পরিচয়বাহী। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, অন্যান্য বেদ অপেক্ষা এককালে অথর্ববেদ অনেক বেশী জনপ্রিয় ছিল।

বৈদিক সাহিত্যের শেষের দিকে সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদের বাইরেও এক বিশাল সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, যার নাম বেদাঙ্গ। সম্যক্ রূপে বেদ বোঝার জন্য ষড়বেদাঙ্গ একান্ত অপরিহার্য।

নামকরণ : অঙ্গীর অর্থাৎ প্রধানের যা উপকারক তাকেই বলা হয় অঙ্গ। বেদাঙ্গ বেদের অঙ্গস্বরূপ। বেদের অর্থাৎ সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ সমূহের পাঠের, তাদের অর্থবোধের ও বিভিন্ন যজ্ঞে বিনিয়োগের সহায়ক শাস্ত্রগুলিকে বলা হয় বেদাঙ্গ।

রচনাকাল : উপনিষদের যুগে বেদাঙ্গ রচনা শুরু হয়েছিল এবং কোন কোন বেদাঙ্গ তারও পূর্বেই রচিত হয়েছিল বলে মনে হয়। উপনিষদগ্রন্থে বেদাঙ্গের নাম দৃষ্ট হয়। বেদাঙ্গগুলি সূত্রাকারে নিবদ্ধ, স্বল্পাক্ষর, অসন্দিগ্ধ ও বিশ্বতোমুখ — "স্বল্পাক্ষরমসংদিগ্ধং সারবদ্ বিশ্বতোমুখম্।" Max Muller-এর মতে ৬০০-২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বেদাঙ্গগুলি রচিত হয়েছিল। Macdonell-এর মতে ৫০০-২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বেদাঙ্গ সমূহের রচনাকাল।

বেদাঙ্গের প্রকারভেদ : বেদাঙ্গ সংখ্যায় ছয়টি শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, ছন্দ ও জ্যোতিষ—

"শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দসোংচয়ঃ।
জ্যোতিষাময়নং চৈব ষড়ঙ্গো বেদ উচ্যতে।।"

এই এক একটি বেদাঙ্গের দ্বারা এক এক প্রকার প্রয়োজন সাধিত হয়। পাণিনীয় শিক্ষায় বেদকে পুরুষরূপে কল্পনা করে ছয়টি বেদাঙ্গকে সেই পুরুষের বিভিন্ন অঙ্গ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে—

"ছন্দঃপাদৌ তু বেদস্য হস্তৌ কল্পোহথ পঠ্যতে।
জ্যোতিষাময়নং চক্ষুর্নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে।।
শিক্ষা ঘ্রাণং তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্।
তস্মাৎ সাঙ্গমধীত্যৈব ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।।"

পণ্ডিত প্রবর Winternitz বেদাঙ্গের প্রাচীন রীতির বিভাগকে স্বীকার করলেও এদের মধ্যে 'কল্প' বা 'কল্পসূত্রের' পৃথক মূল্য নির্ধারণ করেছেন — "Ritual (Kalpa) which constitutes the chief contents of the Brahmanas in then the first Vedanga to receive systematic treatment in special manuals, the so-called Kalpasutras." নিম্নে বেদাঙ্গগুলি সংক্ষেপে আলোচিত হল।

শিক্ষা : শিক্ষা হল প্রথম বেদাঙ্গ। বৈদিক মন্ত্র, স্বর, মাত্রা ইত্যাদির যথাযথ উচ্চারণ ও প্রয়োগবিধি এবং বর্ণ, স্বর, মাত্রা প্রভৃতি বিষয়গুলি যে শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হয়েছে তার নাম শিক্ষা। ইংরেজীতে একে ধ্বনিবিজ্ঞান (Phonetics) বলা হয়। প্রত্যেকটি বেদের পৃথক পৃথক শিক্ষা গ্রন্থ ছিল। সামবেদের 'নারদশিক্ষা', শুক্লযজুর্বেদের 'যাজ্ঞবল্ক্য শিক্ষা' এবং

অথর্ববেদের 'মাণ্ডুকী শিক্ষা' পাওয়া গেলেও ঋগ্বেদের শিক্ষাগ্রন্থ আজও আবিষ্কৃত হয়নি। পাণিনীয় শিক্ষাকেই ঋগ্বেদের শিক্ষাগ্রন্থরূপে ধরা হয়। বৈদিক মন্ত্রের উচ্চারণ প্রমাদ পরিহারের জন্য শিক্ষা শাস্ত্রের জ্ঞান অপরিহার্য্য। প্রাতিশাখ্যের সঙ্গে শিক্ষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

কল্প : যার দ্বারা যজ্ঞাদিকল্পিত অর্থাৎ সমর্থিত হয় তাকে বলা হয় কল্প। কালক্রমে যজ্ঞের প্রণালী এবং বেদের ব্রাহ্মণভাগ এতই জটিল ও বিস্তীর্ণ হয়ে পড়েছিল যে, তার সংক্ষিপ্তসার সংগৃহীত না হলে যজ্ঞ ব্যাপার দুরূহ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঐ সকল যজ্ঞপ্রণালীর সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া কল্পসূত্রে আলোচিত হয়েছে। সুতরাং কল্পশাস্ত্র বৈদিক কর্মানুষ্ঠানক্রমের নির্দেশ। এই শাস্ত্র বৈদিক কর্মকাণ্ডের পর্যায়ভুক্ত। কল্পসূত্রগুলি তিনভাগে বিভক্ত — শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র এবং ধর্মসূত্র। শ্রৌতসূত্রে আছে বেদবিহিত শ্রৌতযাগের বিধি। গৃহ্যসূত্রে লিপিবদ্ধ আছে গৃহস্থের করণীয় সংস্কার। প্রাচীন ভারতের সমাজ ব্যবস্থা বিষয়ে জ্ঞান লাভের জন্য গৃহ্যসূত্রের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। নৃতাত্ত্বিকদের নিকটও এগুলির মূল্য যথেষ্ট। অধ্যাপক Winternitz-ও তাই বলেন — ".....These Grahyasutras, insingnificant thought they may be as literary works, afford us a deep insight into the life of the ancient Indians. The are is trugh a real treasure for the ethnologist." ধর্ম জীবনের সম্পাদ্য অনুষ্ঠানগুলি বিবৃত হয়েছে ধর্মসূত্রে। তাই কল্পশাস্ত্র প্রাচীন ভারতীয় আর্যগণের জীবন যাত্রার ইতিহাসের এক অমূল্য সম্পদ। চারটি বেদের যতগুলি শাখা ছিল ততগুলি শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র ও ধর্মসূত্র রচিত হয়েছিল। বেদের বিভিন্ন শাখা লুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কল্পশাস্ত্রগুলিও বিলুপ্ত হয়েছে। কল্পশাস্ত্রের প্রণেতারূপে আশ্বলায়ন, সংখ্যায়ন, আপস্তম্ব, কাত্যায়ন, বৌধায়ন প্রভৃতি ঋষির নাম উল্লেখযোগ্য।

নিরুক্ত : ছয় বেদাঙ্গের মধ্যে নিরুক্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। 'নির্' অর্থাৎ নিঃশেষে বৈদিক পদসমূহ যে গ্রন্থে 'উক্ত' অর্থাৎ আলোচিত হয়েছে, তার নাম নিরুক্ত। নিরুক্ত এক হিসাবে বৈদিক শব্দাভিধান বা মন্ত্রভাষ্য। বৈদিক ঋষিগণ কোন্ মন্ত্রে কি অর্থে কোন্ শব্দ প্রয়োগ করেছেন তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নিরুক্ত গ্রন্থে। নিরুক্তকাররূপে যাস্কাচার্যই প্রসিদ্ধ। নিঘন্টু অর্থাৎ বৈদিক শব্দকোষের আলোচনাই হল নিরুক্ত।

নিরুক্তের তিনটি ভাগ — **নৈঘন্টুককাণ্ড, নৈগমকাণ্ড** এবং **দৈবতকাণ্ড**। **নৈঘন্টুক কাণ্ডে** আছে সমানার্থক শব্দের উপদেশ। অনেকের মতে নিঘন্টু যাস্কাচার্যেরই রচনা। মহাভারতে অবশ্য কাশ্যপ প্রজাপতিকে নিঘন্টুর রচয়িতা বলা হয়েছে। নিঘন্টুতে নেই এমন কিছু শব্দের ব্যাখ্যাও নিরুক্তে দেখা যায়। তাই দুর্গাচার্য মনে করেন যে, পূর্বে একাধিক নিঘন্টু ছিল। **নৈগমকাণ্ডে** আছে বেদে প্রযুক্ত শব্দের উৎপত্তি ও অর্থ দৃষ্টান্ত সহ ব্যাখ্যা। তাই আধুনিক ভাষাতত্ত্বের প্রথম নিদর্শনরূপে নৈগমকাণ্ডকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্বীকার

করেছেন। এ বিষয়ে অধ্যাপক এস্. কে. বেলবেলকর বলেন — ".....He definitely formulates the theory that every noun is derived from a verbal root and meets the various objections raised against it-a theory on which the whole system of panini is based, and which is in fact, the postulate of modern philology." দৈবতকাণ্ডে আছে দেবতা তত্ত্বের বিস্তৃত বিচার। এই কাণ্ডে ভূলোক, অন্তরীক্ষলোক ও দ্যুলোকভেদে দেবতাদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে যাস্ক দেবতাদের নিবাসস্থান, লক্ষণ, কার্য এবং রূপের বর্ণনা করেছেন। নিরুক্তের তিনটি কাণ্ড মোট দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। নিরুক্তের দৈবতকাণ্ডে দেখা যায়, দেবতা ও অসুরের বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিষয়ের কল্পিত রূপ, অগ্নির সাথে বিদ্যুতের বিজ্ঞানধর্মী পার্থক্য, আতস কাঁচের কথা এবং সূর্যতেজের একাংশ দ্বারাই যে চন্দ্র প্রদীপ্ত হয় ইত্যাদি বিজ্ঞানধর্মী আলোচনা।

ব্যাকরণ : সর্বকালের শিক্ষা ব্যবস্থায় 'ব্যাকরণ' এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। বৈদিক সাহিত্য আলোচনা অর্থাৎ বেদের অর্থবোধের জন্য ব্যাকরণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সেই কারণে ব্যাকরণকে বেদের মুখ বলা হয়েছে — "মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্"। ব্যাকরণ শব্দের অর্থ যা ব্যাকৃত অর্থাৎ বিশ্লেষিত করে তাকেই ব্যাকরণ বলে। বৈয়াকরণ ভর্তৃহরি ব্যাকরণকে অপবর্গের বা মোক্ষের দ্বার বলেছেন—

"তদ্দ্বারমপবর্গস্য বাঙ্মলানাং চিকিৎসিতম্।
সর্ববিদ্যাপবিদ্রোহয়মধিবিদ্যং প্রকাশতে।।"

বর্তমানে প্রচলিত ব্যাকরণগ্রন্থ গুলির মধ্যে একমাত্র পাণিনির ব্যাকরণেই বৈদিক ব্যাকরণ আলেচনা দৃষ্ট হয় এবং প্রাচীনতম ব্যাকরণগুলির মধ্যে 'অষ্টাধ্যায়ী' অন্যতম বলে স্বীকার করা হয়। একালের অগ্রণী ভাষাবিজ্ঞানী Bloomfield-এর ভাষায় পাণিনীয় ব্যাকরণ— ".....one of the greatest monuments of human intelligene" "it describes, with minutest detail, every inflection, derivation and composition, and every syntactic use of its author's speech. No other language to this day has been so perfectly described..... . The Indian grammar presented to European eyes. for the first time a complete and accurate description of a language based not upon theory but upon observations." ব্যাসদেব ও মহেশের প্রাচীনতর ব্যাকরণের নাম শোনা গেলেও দুর্ভাগ্যবশতঃ তা আজও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। পাণিনির সূত্রাবলীর সাথে পরবর্ত্তীকালে বররুচি ও কাত্যায়নের বার্তিক এবং পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য' যুক্ত হয়েছে। ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রয়োজন বোঝার জন্য বার্তিককার একটি সূত্রে বলেছেন — "রক্ষোহাগমলঘ্বসন্দেহাঃ প্রয়োজনম্।" অর্থাৎ রক্ষা, ঊহ, আগম, লঘু ও অসন্দেহ — এই পাঁচটি ব্যাকরণ অধ্যয়নের মুখ্য প্রয়োজন। বর্তমানে প্রচলিত ব্যাকরণ গ্রন্থগুলির মধ্যে একমাত্র পাণিনির ব্যাকরণেই বৈদিক ব্যাকরণের আলোচনা দৃষ্ট হয়।

রক্ষা—বেদ রক্ষার জন্য ব্যাকরণের প্রয়োজন। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি বলেছেন — 'রক্ষার্থং বেদনামধ্যেয়ং ব্যাকরণম্।" প্রকৃতি, প্রত্যয়, সন্ধি, সমাস প্রভৃতির সঠিক জ্ঞানই হল রক্ষা।

ঊহ—যা ঊহ্য তা নিজে বিচার করে ঠিক করে নেওয়াকে 'ঊহ' বলে। ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকলে মন্ত্রগত পদের রূপান্তর সম্ভব নয়।

আগম—'আগম' হল আবশ্যিক নিয়ম। কোন প্রয়োজন থাকুক না থাকুক, বাধ্যতামূলকভাবে ব্রাহ্মণকে ছয়টি অঙ্গসহ বেদ অধ্যয়ন করতে ও জানতে হবে — "ব্রাহ্মণেন নিস্কারণো ধর্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোহধ্যেয়োজ্ঞেয়শ্চ।"

লঘু—'লঘু' শব্দের অর্থ সংক্ষেপে ভাষাবিষয়ক জ্ঞান। সংক্ষেপ বা লঘুতার জন্যই ব্যাকরণের প্রয়োজন।

অসন্দেহ—বেদে ব্যবহৃত শব্দ এবং বাক্যের সন্দেহ নিরসনই হল 'অসন্দেহ'।

ছন্দ : "ছাদয়তীতি ছন্দঃ।" বেদমন্ত্র পাঠ করতে হলে ছন্দের জ্ঞান একান্ত আবশ্যক। কারণ চতুর্বেদের অধিকাংশ মন্ত্রই ছন্দোবদ্ধ। তাই বলা হয় যে, ছন্দ পাপ থেকে যজমান ও পুরোহিতদের আচ্ছাদিত অর্থাৎ রক্ষা করে। অনেকের মতে মন্ত্রদর্শন কালে ঋষিগণের অনুভূত হিল্লোল বা স্পন্দনই ছন্দের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। প্রধান বৈদিক ছন্দ সংখ্যায় সাতটি — গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ্ এবং জগতী। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে বেদের এই সাতটি ছন্দকে বেদরূপী পরম পুরুষের সাতটি হস্তরূপে কল্পনা করা হয়েছে—

"চত্বারি শৃঙ্গাস্ত্রয়োহস্য পাদা-
দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্য।
ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি
মহো দেবো মর্ত্ত্যা আবিবেশ।"

বৈদিক যুগের ছন্দো গ্রন্থগুলি আজও পাওয়া যায়নি। পরবর্ত্তীকালে আচার্য গঙ্গাদাস প্রণীত 'ছন্দোমঞ্জরী' বিখ্যাত ছন্দোগ্রন্থ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।

জ্যোতিষ : বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের যথাযথ কাল নির্ধারণের জন্য জ্যোতিষশাস্ত্র অবশ্য প্রয়োজনীয়। যজ্ঞের প্রয়োজনে তিথি নক্ষত্রের বিশেষ অবস্থান বিচার যে শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে তাকে জ্যোতিষশাস্ত্র বলে। বেদে, বিশেষত ব্রাহ্মণে গৃহ্যাদি কর্মের বিশিষ্টকাল ঋতু, তিথি, নক্ষত্র ইত্যাদির কথা বর্ণিত হয়েছ। সুতরাং সংবৎসর, মাস, পক্ষ, দিন, তিথি, নক্ষত্র প্রভৃতির জ্ঞান না থাকলে বৈদিক যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান অসম্ভব। বৈদিক যুগের কোন জ্যোতিষশাস্ত্র পাওয়া যায় নি। লগধের 'বেদাঙ্গ জ্যোতিষ' নামে একটি মাত্র গ্রন্থ পাওয়া যায়। যাজুষ ও আর্চ ভেদে তার দুটি শাখা আছে। পরবর্ত্তীকালে গ্রহ নক্ষত্রাদির অবস্থান ও প্রভাব বিচারে ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা যথেষ্ট প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে।

বেদাঙ্গের গুরুত্ব : সূত্রাকারে রচিত বেদাঙ্গগুলির সাহিত্যিক মূল্য খুব একটা না থাকলেও এদের ব্যবহারিক মূল্য অনেক। তাই বলা হয়েছে — "অত্যন্ত স্বল্পাক্ষরে একটি সারসত্যকে এমনভাবে প্রকাশ করা হবে, যাতে সংশয়ের কোনও অবকাশ থাকবে না অথচ অর্থের ব্যঞ্জনা হবে বিশ্বতোমুখ — এই হল সূত্রের লক্ষণ। সূত্র সাহিত্যে আর্যদের বৈজ্ঞানিক মনীষার আশ্চর্য পরিচয় পাওয়া যায়। "Winternitz বলেন — "The works serve a purely practical purpose. They are to present some scien systematically in concise brevity, so that the pupil can easily commit it to memory. There is probably nothing like these sutras of the Indias in the entire literature of the world." পরবর্তীকালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যে উৎকর্ষ দেখা গিয়েছিল, সেগুলির উৎস ও বেদাঙ্গ সাহিত্য, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মননশীলতার আদি দৃষ্টান্ত হিসাবে এই বেদাঙ্গগুলির ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।

ব্রাহ্মণ

বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাসে ব্রাহ্মণ সাহিত্য একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বৈদিক মন্ত্রের বিভিন্ন প্রকারের ব্যাখ্যাসহ বেদের যে অংশে যাগযজ্ঞাদির বিবরণ পাওয়া যায়, তাকেই 'ব্রাহ্মণ সাহিত্য' বলে অথবা মন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মক বেদের দ্বিতীয় অংশ হল 'ব্রাহ্মণ সাহিত্য'।

নামকরণ : ব্রাহ্মণ শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। 'ব্রহ্মণ্' শব্দের অর্থ 'মন্ত্র' বা বেদমন্ত্র অথবা ব্রাহ্মণ পুরোহিত — অতএব পুরোহিতের যজ্ঞ সম্পর্কিত মতামতের আলোচনাই ব্রাহ্মণ। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি বলেছেন, ব্রহ্মণ্ ও ব্রাহ্মণ্ শব্দ দুটি সমার্থক — "সমানার্থাবেতৌ ব্রহ্মণ্শব্দো ব্রাহ্মণ শব্দশ্চ।" অতএব যজ্ঞে অংশগ্রহণকারী পুরোহিতদের জন্য যে পুস্তক বা শাস্ত্র তা-ই ব্রাহ্মণ। আচার্য জৈমিনি ব্রাহ্মণের লক্ষণ করতে গিয়ে বলেছেন — "শেষে ব্রাহ্মণশব্দঃ।" Martin Haug মনে করেন যে, ব্রাহ্মণ শব্দটি যজ্ঞের ত্রিবেদবিদ্ ব্রহ্মা নামক পুরোহিতকে নির্দেশ করে। সুতরাং ব্রাহ্মণ নামক পুরোহিতের অনুশাসন বা উক্তি সমূহ হল ব্রাহ্মণ। অধ্যাপক Weber বলেন যে, 'ব্রাহ্মণ' শব্দটি শুক্লযজুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণে যজ্ঞানুষ্ঠান বিষয়ক গ্রন্থরূপে সর্বপ্রথম প্রযুক্ত হয়েছে। আবার "ব্রহ্ম বৈ ব্রাহ্মণঃ" এই অর্থে ব্রহ্মা বিষয়ক আলোচনা যে গ্রন্থে আছে তা-ই ব্রাহ্মণ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ভাষ্য ভূমিকায় সায়নাচার্য বলেছেন—

"মন্ত্রশ্চ ব্রাহ্মণতি দ্বৌ ভাগৌ তেন মন্ত্রতঃ।
অন্যদ্ ব্রাহ্মণমিত্যেতদ্ভবেদ্ ব্রাহ্মণ লক্ষণম্।।"

অপরপক্ষে মহর্ষি আপস্তম্বের মতে — "কর্মচোদনা ব্রাহ্মণানি।" অর্থাৎ যাগযজ্ঞাদি কর্মের চোদনা বা নির্দেশমূলক শাস্ত্রই ব্রাহ্মণ।

চারটি বেদের ব্রাহ্মণ : চারটি বেদের ব্রাহ্মণগুলি হল—

ঋগ্বেদ—ঐতরেয় ও কৌষীতকী বা সাংখ্যায়ন।

সামবেদ—পঞ্চবিংশ, ষড়বিংশ, সামবিধান, আর্ষেয়, দৈবত, ছান্দোগ্য, সংহিতোপনিষদ্, বংশ, শাট্যায়ন, জৈমিনীয় বা তবলকার ব্রাহ্মণ।

যজুর্বেদ—কৃষ্ণযজুর্বেদ — তৈত্তিরীয়। শুক্লযজুর্বেদ — শতপথ ব্রাহ্মণ।

অথর্ববেদ — গোপথ ব্রাহ্মণ।

রচনাকাল : ব্রাহ্মণ সাহিত্যের রচনার সূত্রপাত কবে হয়েছিল তা নির্ণয় করা দুষ্কর। তবে Max Muller-এর মতে ব্রাহ্মণ সাহিত্যের সংকলন কাল ৮০০-৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। অপরপক্ষে পণ্ডিত প্রবর Winternitz মনে করেন ২০০-১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দই ব্রাহ্মণ সাহিত্যের রচনাকাল। সুতরাং সংহিতা যুগের পরেই ব্রাহ্মণ্য যুগের রচনা। এর থেকে বেশী নির্দিষ্ট করে ব্রাহ্মণ সাহিত্যের রচনাকাল নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

আলোচ্য বিষয় : আপস্তম্ব বেদের ব্রাহ্মণ ভাগের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর মতে মূলতঃ ছয়টি বিষয় ব্রাহ্মণে আলোচিত হয়েছে। যথা — বিধি, অর্থবাদ, নিন্দা, প্রশংসা, পুরাকল্প ও পরকৃতি। এই ছয়টি বিষয় ব্যাখ্যা করলে ব্রাহ্মণের আলোচ্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়।

বিধি : বিশেষ বিশেষ যজ্ঞ কর্মানুষ্ঠানের জন্য যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাকে বলা হয় বিধি। যেমন — "স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত"। অর্থাৎ স্বর্গকামী ব্যক্তি অশ্বমেধ যজ্ঞ করবে ইত্যাদি এইরূপ বাক্যগুলি বিধিবাক্য। এরূপ প্রবচন বিধিবাক্য ব্রাহ্মণ গ্রাহ্যগুলিতে নির্দিষ্ট হয়েছে।

অর্থবাদ ঃ বেদমন্ত্রের অর্থপ্রসঙ্গে এবং বিবিধ ক্রিয়াকাণ্ড সম্পর্কে ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, সেই ব্যাখ্যাগুলিকে বলা হয় অর্থবাদ। এখানে দর্শনগত, ব্যাকরণগত ও ভাষা সংক্রান্ত আলোচনা দৃষ্ট হয়।

নিন্দা : বিরোধী মতের সমালোচনা খণ্ডন ও তার পরিহারকে নিন্দা বলে। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে যে যে অংশে পরমত খণ্ডন এবং স্বমত স্থাপন করার জন্য বিতর্ক দেখা যায়, সেই অংশগুলি এই নিন্দার অন্তর্গত। যেমন — "তৎ তথা ন কর্তব্যম্", "তৎ তথা ন হোতব্যম্" ইত্যাদি ব্রাহ্মণবাক্য নিন্দাসূচক।

প্রশংসা : ব্রাহ্মণ গুলিতে কোন কোন ক্রিয়ার অনুমোদনের জন্য সেগুলির স্তুতি বা প্রশংসা করা হয়েছে। যেমন — "যৎ স্তূয়তে তৎ বিধীয়তে, যন্নিন্দ্যতে তন্নিষিধ্যতে।" অর্থাৎ যা প্রশংসিত তা করণীয় এবং যা নিন্দিত তা পরিহার্য্য।

পুরাকল্প : অতি প্রাচীনকালে যে সকল যজ্ঞ সম্পাদিত হয়েছিল, সেগুলিকে বলা হয়েছে পুরাকল্প। দেবতাদের অনুষ্ঠিত যাগ-যজ্ঞাদির যে সব কাহিনী ব্রাহ্মণগুলিতে উল্লিখিত হয়েছে, সেইসব বৃত্তান্ত পুরাকল্পের অন্তর্গত।

পরকৃতি : ব্রাহ্মণের অন্তিমলক্ষণ পরকৃতি। "পরস্য কৃতিঃ পরকৃতিঃ" অপরের কার্যকে

বলা হয় পরকৃতি। যজ্ঞকর্মে অভিজ্ঞ খ্যাতনামা পুরোহিতগণের কীর্তি, বিখ্যাত রাজাদের যাগযজ্ঞ, দান, দক্ষিণা প্রভৃতি বিবরণকে বলে পরকৃতি।

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার ইতিহাসে ব্রাহ্মণ গ্রন্থের গুরুত্ব বা উপযোগিতা

অনেকের ধারণা ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে শুধু যাগযজ্ঞের কথাই আছে। পাশ্চাত্ত্য পন্ডিতদের মধ্যে কেউ কেউ ব্রাহ্মণকে "Manual of sacrifice" অর্থাৎ যজ্ঞের প্রক্রিয়াপঞ্জী বলেছেন। কেউ কেউ আবার ব্রাহ্মণকে বলেছেন — "Theological twaddle" অর্থাৎ ঈশ্বর ও পরলোক সম্বন্ধে অর্থশূন্য বাগাড়ম্বর মাত্র। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি আলোচনা করলে দেখা যায় যে, এতে কেবল যাগ-যজ্ঞাদির কথাকেই প্রাচীন ভারতের ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির সম্যক্ অবগতির জন্য ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি অধিকতর প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন পন্ডিতগণ। এ প্রসঙ্গে সার্থক মন্তব্য করেছেন পন্ডিত প্রবর ডঃ যোগীরাজ বসু — "In fact, they (i.e. the Brahmanas) as compendiums of ancient Indian culture and civilisation in its multifarious aspects." ব্রাহ্মণ সাহিত্যের দুষ্প্রবেশ্য মরুভূমিতে আখ্যান, উপাখ্যান ও গাথা জাতীয় রচনাগুলি মরুদ্যানস্বরূপ। পরবর্ত্তী সংস্কৃত সাহিত্যে এ জাতীয় রচনার প্রভাব অনস্বীকার্য। মহাকাব্য ও পুরাণ সাহিত্যে বর্ণিত বহু উপাখ্যানের বীজ নিহিত আছে ব্রাহ্মণ সাহিত্যে। তাছাড়া বৈদিক ভারতে জাতিভেদ প্রথা, সমাজে নারীর স্থান, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের যে চিত্র ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়, তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাজেই সকল দিক বিচার করে ব্রাহ্মণ সাহিত্যকে নিছক যজ্ঞীয় অনুষ্ঠান সম্পর্কিত নীরস বিষয় বহুল গ্রন্থ মনে করলে ভুল করা হবে। তাই ব্রাহ্মণের উপযোগিতা স্বীকার করে নিতে হবে। ব্রাহ্মণ গ্রন্থ সমূহে সাহিত্য লক্ষণের অনুপস্থিতি এর কষ্ট পাঠ্যতা প্রভৃতি দোষের কথা স্বীকার করেও Winterniz বলেছেন — ".....indispensable to the understanding of the whole of the later religious and philosophical literature of the Indians and highly interesting for the general science of religion." একালের বিখ্যাত ঐতিহাসিক কে. এম. পানিক্করও সমগ্র বৈদিক সাহিত্য সম্পর্কে বলেন যে এগুলি "Constitute a body of literature which is supremely important for the organisation of Hindu as a society."

ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির মূল্য বা গুরুত্ব বিচার করতে গিয়ে ড. সুকুমার সেন বলেন — ".....ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি গদ্যে লেখা। এ গদ্যের মূল্য শুধু ভারতীয় সাহিত্যে সবচেয়ে পুরানো বলিয়াই আদরণীয় নয় ; সহজ, সরল কথা ভাষার নিকটবর্তী এবং রসবাহী গদ্য বলিয়াই এগুলির অসাধারণ মর্যাদা। কোন দেশের এত পুরানা সাহিত্যে এমন সুন্দর সাধু, গদ্য আছে বলিয়া আমার জানা নাই। এ গদ্য যাহারা লিখিয়াছিলেন তাঁহাদের অনুবর্তীরা উত্তরসূরীরা এপথে চলেন নাই। তাঁহারা যাহাকে এখন বলে ডাইজেস্ট (অর্থাৎ সারসংগ্রহ) সেই রকম বই লিখিতে লাগিলেন তাহার ফলে ব্রাহ্মণের সম্ভাবনাময় চমৎকার গদ্যরীতি সূত্র-রীতিতে